শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এক দিন বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তথায় পাঠ শুনাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া গেলেন। পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ পাঠ শ্রবণান্তর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবং তদবস্থায় লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক চৈতন্যদেবের আসনে উপবেশন করিলেন। বৈষ্ণবচরণ তদ্দর্শনে, "আজ আমার ভাগবত পাঠ সার্থক হল, সাক্ষাৎ চৈতন্যদেব উদয় হয়েছেন, আর পাঠ করবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া পাঠ শেষ করিলেন, এবং খোল করতাল আনিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মহানন্দে কীর্ত্তন ও নিত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত অধিকাংশ লোকে সেই কীর্ত্তনে যোগ দিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুটীকতক লোকের এ সমস্তই একেবারেই ভাল লাগিল না, তাঁহারা নিন্দা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এই ঘটনায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অম্বিকা-কাল্‌না নিবাসী ভগবান্ দাস গোস্বামী, এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে স্থির করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন ব্রাহ্মসমাজী, কারণ তাহা না হইলে এরূপ সাহস ও ধৃষ্টতার কার্য্য আর কে করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছু পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অম্বিকা কাল্‌নাতে ভগবান্ দাস গোস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষ আছেন জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরানাথ কহিলেন "আচ্ছা বাবা, চল একখানা নৌক করে যাওয়া যাক্। হাওয়াও খাওয়া হবে, আর ভগবান্ দাসকেও দেখা হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন "আর নবদ্বীপ দর্শনও হবে।" মথুর দুই এক দিনের মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব, হৃদয় এবং আপনার স্ত্রী ও পরিচারকগণ সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কাল্‌নায় উপনীত হইবার পরদিন প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একখানি লাল

বনাতে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া এবং হৃদয় একখানি উৎকৃষ্ট শাল গায় দিয়া ভগবান্ দাসের আখড়ায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে হৃদয়কে কহিলেন, "দেখ্, হৃদু, তুই আমার কথা তাকে কিছু বলিস্‌নি। আমি যখন বলব তখন কথা কইবি, নইলে চুপ করে থাকিস্।" হৃদয় সমস্ত রহস্য বুঝিলেন। তাঁহারা আখড়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ভগবান দাস জপ করিতেছেন। লোকটির বয়ঃক্রম অন্যূন অশীতিবর্ষ, বর্ণ গৌর, মুণ্ডিত মস্তক, তাহার উপর টিকি, যেন পাকা আমটী। দুই জনে ভগবান্ দাসের নিকট যাইয়া প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। ভগবান্ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হতে আস্‌ছেন?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "কোলকেতা থেকে।"

বাবাজী কহিলেন, "বটে, কোলকেতা থেকে এখানে কেউ এলে আমাকে দর্শন কর্ত্তে আসে।"

হৃদয় বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা আস্‌বে বই কি! আপনি মহাপুরুষ, আপনাকে দেখ্‌তে ত আসবেই।" বাবাজী এই কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া হাসিলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এই সময় অন্য একজন গোস্বামী আসিয়া ভগবান্ দাসকে কহিলেন, "দেখুন বাবাজী মশাই, অমুক বৈষ্ণব আমাদের এখানে না জানিয়ে কাল মোচ্ছব করেছে।"

ভগবান্ দাস এ কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, "বটে! ব্যাটার ত বড় অহঙ্কার হয়েছে! বেটা অবৈষ্ণব! বেটাকে জুতো মেরে কণ্ঠী ছিঁড়ে নেব!"

বাবাজী মহাশয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় কহিলেন, "বাবাজী মশাই, এ কি হচ্ছে? মালা জপ কর্‌তে কর্‌তে এ সব কি রকম কথা ব'লূচেন?"

ভগবান্ দাস উত্তর করিলেন, "আমার কি আর জপ তপ আছে, সে সব অনেক কাল উঠে গেছে। তবে যে মালা ফেরাই, তা কেবল জীবশিক্ষার জন্যে বই ত না। আমি না এ রকম কল্লে জীব উদ্ধার হবে কি করে?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোমার ত ভারি অহঙ্কার! তুমি জীবকে শিক্ষা দেবে? জীবকে শেখাবার তুমি কে? জীবকে উদ্ধার কর্‌বার তুমি কেহে বাপু?" তাঁহার তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাবাজীর যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ইনি যে দেখ্‌ছি মহাপুরুষ। এ যে দেখ্‌ছি মহা অপরাধ হয়েছে, এতক্ষণ এঁকে চিন্‌তে পারিনি।" ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব হইল, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়নযুগল স্তিমিত, বদনে সুমধুর হাস্য—দেখিয়া বাবাজী মহাশয়ও দণ্ডায়মান হইলেন এবং করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "তাইত আজ এ মহাপুরুষ কোথা থেকে এলেন। আজ আমার কি সৌভাগ্য।" তৎপরে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই ইনি কোথায় থাকেন? ইনি কে, মশাই?" বাবাজী এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হৃদয়ও তাহার যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। এদিকে হৃদয় অতি যত্ন সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ধরিয়া আছেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে অবস্থিতি করেন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দাস বাবাজী অতি ব্যগ্রতা সহকারে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, আমি এঁর কাছে অত্যন্ত অপরাধী। ইনিই কি কোলুটোলার চৈতন্য মহাপ্রভুর আসনে বসেছিলেন?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ভগবান্‌দাস আরও কাতর ভাবে কহিতে লাগিলেন, "আমি এঁর কাছে মহা অপরাধী। এঁকে না চিন্‌তে পেরে এঁর অনেক নিন্দে করিচি। আমার এ অপরাধ ইনি না ক্ষমা কর্‌লে, আমার গতি কি হবে? আমি জানতুম না যে, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর উদয় হয়েছে। ইনিই ত সেই আসনের যোগ্য, এঁরইত সেই আসন। ইনিই ত মহাপ্রভু, আমি এর নিন্দে করে মহা অপরাধ করিচি। মশাই, আপনি বলুন, আমি এ অপরাধ হতে কি করে মুক্ত হব?" এইরূপ দারুণ কাতরোক্তি করিয়া ভগবান্ দাস ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হৃদয় আশ্বাসবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "আপনার কোন শঙ্কা নেই। ইনি কারুর অপরাধ নেন না। আপনার কোন ভয় নেই মশাই।" হৃদয়ের কথায় বাবাজী যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক চরণধূলি লইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হৃদয় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বীজ মন্ত্রোচ্চরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য আসিতে লাগিল, তিনি অতি ধীরে ও অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?"

হৃদয় কহিলেন, "আপনি যে ভগবান্‌দাস বাবাজীকে দেখতে এসেছেন। এই তাঁর আখ্ড়া" হৃদয় এইরূপ দুই তিন বার বলিলে পর তাঁহার আরও বাহ্যজ্ঞান আসিল, তখন তিনি বলিলেন, "তোমার নাম ভগবান্ দাস?"

বাবাজী কহিলেন, "আমি আপ্‌নার দাস।" হৃদয় আপনার গাত্র হইতে শালখানি খুলিয়া তথায় পাতিলেন এবং তদুপরি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে বসাইলেন। ভগবান্ দাস আপনার পূর্ব্ব অপরাধের

উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনাইয়া তাঁহাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখনও তিনি ভাবের ঘোরে ছিলেন সুতরাং হৃদয় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন কিন্তু উহা তাঁহার গলাধঃকরণ হইল না। ভগবান্ দাস প্রাণের আবেগে হৃদয়ের নিকট আপনার নানা দুঃখের কথা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের আর পূর্ব্ববৎ সেবা চলিতেছে না; অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন তাঁহার কুটীরখানি পতনোন্মুখ হইয়াছে, এমন সঙ্গতি নাই যে, তাহার সংস্কার করান। শীতকাল, ক্রমে বেলা প্রায় দশটা হইয়াছে অনুমান করিয়া হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেই ঘোরের অবস্থায় লইয়া নৌকায় গমন করিলেন।

এ দিকে মথুরানাথও বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে লোক জন সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য ভগবান্ দাসের আখড়াভিমুখে গমন করিলেন। আখড়ায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক ভগবান্ দাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, এখানে একজন মহাপুরুষ এসেছেলেন, তিনি কোথায় গেলেন বল্‌তে পারেন ?"

ভগবানদাস কহিলেন, "আহা তিনি মহাপুরুষ নন, সাক্ষাৎ মহা-প্রভু। আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, তাঁর দর্শন পেলুম। তিনি অল্পক্ষণ হল এ স্থান হতে গেছেন।" মথুরানাথ বুঝিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব তবে অন্য কোন পথ দিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার সহিত পথে সাক্ষাৎ হয় নাই। বিদায় লইবার সময় মথুরানাথ বাবাজীকে দশটী টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বাবাজী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বাবাজীটি বেশ—সিদ্ধ হয়েছে। আহা দেখ মথুর, ওর ঠাকুরের সেবা চল্‌ছে না, বড়ই কষ্ট। তুমি কিছু দিয়েছ কি?"

মথুর কহিলেন "হ্যাঁ বাবা দশ টাকা দিয়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, আরও কিছু বেশী করে দেও।" এই কথা শুনিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ আর নব্বই টাকা লোক দ্বারা ভগবান্‌দাসকে পাঠাইয়া দিলেন। ভগবানদাস টাকাগুলি পাইয়া কহিলেন, "আহা, দুঃখহারী মহাপ্রভু আজ আমার দুঃখ মোচন করবার জন্যেই এসেছিলেন। এখন কিছুদিন ঠাকুরের সেবা চল্‌বে।"

এখান হইতে নৌকা নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিল। নৌকা নবদ্বীপের সম্মুখীন হইবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে এতই উন্মত্ত হইলেন যে, নৌকা হইতে লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, হৃদয় অতি কষ্টে ধরিয়া রাখিলেন। ক্রমে নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার ভাব শান্ত হইল। তিনি তৎপরে তীরে উঠিয়া হৃদয়ের সহিত নবদ্বীপ পরিদর্শন করিয়া আসিলেন। কিন্তু আর কোনও স্থানে তাঁহার ভাব হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছেন, মথুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা কেমন দেখ্‌লে?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখলুম, সে সব স্থান আর নেই, লোপ পেয়ে গেছে। ঐ যে সব চড়া দেখ্‌ছ গঙ্গার মাঝে, আগে ঐ জায়গায় নবদ্বীপ ছিল।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় নৌকায় উঠিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে পূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহার ভাব হইয়াছিল, ঐ সকল চড়ার নিকট নৌকা আসিলে তাঁহার পুনরায় ভাবাবেশ হইতে লাগিল। স্থানটী অতিক্রম করিলে তাঁহার সহজাবস্থা আসিল। মথুরানাথ কহিলেন."ঠিক কথা বাবা, সে সব স্থান লোপ পেয়েছে, গঙ্গার গর্ভে গেছে, নইলে তোমার ত কৈ ওখানে ভাব হল না। নৌকায় সেই একই জায়গায় ভাব হল।"

ফাল্গুন মাস, হৃদয় ছুটী লইয়া সিহোড় যাইবেন তাহার সমস্ত আয়োজন করিতেছেন কিন্তু মনটা যেন ভাল নয়, বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার মাতুলের নিকট আসিলেন, বলিলেন, "মামা, ছুটী পেয়ে মনে কর্‌লুম বাড়ী যাব, পুঁটলী পাঁট্‌লা সব বাঁদ্‌লুম, কিন্তু মামা, বুকের ভেতর যেন কেমন কচ্ছে, যেতে মন সর্‌চে না। তা যাব না মামা, তুমি কি বল?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একে ত ছুটি পাস্‌নি, কত কোরে ছুটি পেলি, তা যাবিনি কেন?"

হৃদয় কহিল, "কি জানি মামা, বুকের ভেতর কি রকম করে উঠ্‌ছে। আমি যাব না মামা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে যাস্‌নি, থাক্।" হৃদয় তখন যাইয়া তাঁহার পুঁটলি খুলিয়া ফেলিলেন, তবে একটু শান্তি বোধ হইল। প্রতিদিন রাত্রিকালে মা কালীর ভোগ আরাত্রিকের পর হৃদয় সেই ভোগের প্রসাদ আনিয়া রামকৃষ্ণদেবকে আহার করাইতেন। অদ্য সন্ধ্যার পর হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত কর্ত্তাবার্ত্তা কহিতেছেন; মা কালীর ভোগ আরাত্রিক হইয়া গেল, হৃদয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া তাঁহাকে আহারের জন্য ডাকিয়া আসিতেছেন; কিন্তু

তিনি যাই বলিয়া পুনরায় মাতার সহিত কথায় মগ্ন হইতেছেন, আসিতেছেন না। তাঁহার মাতা সেই নহবৎখানাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার মাতাও প্রসাদ পাইয়া আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। চন্দ্রাদেবী প্রতিদিনই অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। কিন্তু পরদিন প্রায় আটটা বাজিয়া গেল, তথনও তিনি দ্বার খুলিলেন না। কালীর মা নামক মন্দিরের একজন দাসী প্রতিদিন সকালে আসিয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহকার্য্যে সাহায্য করিত। অদ্য সে ঘরের অনতিদূর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ ও দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দৌড়িয়া হৃদয়কে সম্বাদ দিল। হৃদয় যাইয়া দেখিলেন, দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ এবং ভিতর হইতে ঘড় ঘড় শব্দ আসিতেছে, ডাকিয়া চন্দ্রদেবীর সাড়া পাইলেন না। হৃদয় দ্রুত আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সমস্ত কহিলেন। তিনি অতিশয় চিন্তিত ও অস্থির হইয়া কহিলেন, "অ হৃদু, দরজা কাট্‌তে হবে না কি? দীনু খাতাঞ্জী যে রকমের লোক, দরজা কাটান মুস্কিল। কি করা যায় বল্‌ দেখি? কি করে দরজা খোলা যায়?" এই বলিতে বলিতে তাঁহারা চন্দ্রাদেবীর দরজার নিকট আসিলেন। হৃদয় দরজা ফাঁক করিয়া এক খণ্ড লোহার শিক দিয়া হুড়কা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, বৃদ্ধা বমনাদি করিয়া তদুপরি অচৈতন্য রহিয়াছেন, গলা ঘড় ঘড় করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদ্দৃষ্টে হৃদয়ের গলা জড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যে হৃদু কাল তুই যাস্‌নি। তুই না থাক্‌লে আমার মাকে কে দেখত, কে বা দরজা খুল্‌ত।" হৃদয় তাঁহাকে একটু শান্ত করিলেন, পরে বাহিরে একটী শয্যা পাতিয়া তদুপরি চন্দ্রাদেবীকে অতি কষ্টে শয়ন করাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন

যে, এই সময়ে কবিরাজী ঔষধ কিছু খাওয়াইলে ভাল হয়। হৃদয় তৎক্ষণাৎ এড়িয়াদহের অভয় কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া মধুর সহিত সেবন করাইতে লাগিলেন এবং গঙ্গাজল মুখে দিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিন দিন অতীত হইলে চতুর্থ দিবসে, অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিন তাঁহার নাভিশ্বাস আরম্ভ হইলে তাঁহাকে হৃদয় তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় লইয়া গেলেন। চন্দ্রা-দেবী হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,"দেখিস্ হৃদু, যেন গঙ্গা পাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ দেব অমনি ব্যস্ত হইয়া পুষ্প চন্দন তুলসী লইয়া মাতার চরণে অঞ্জলি দিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "ওই শরীর হতেই এই শরীর হয়েছে।" তিন বার অঞ্জলি দিয়া আপনার ঘরে যাইয়া বসিলেন। হৃদয়কে কহিলেন, "তুই মুখ অগ্নি কোর্‌গে।" হৃদয় কহিল, "তা কি হয়? রামলাল করবে।" ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল সমস্ত কার্য্য করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিলেন না। সেইজন্য সমস্ত কার্য্যাদি শেষ হইলে একদিন ভাবিলেন, "আমি ত মার কোন কাজই করলুম না! তা তর্পণটা করি," ভাবিয়া গঙ্গায় তর্পণ করিতে গেলেন। কিন্তু অঞ্জলি করিয়া জল তুলিবামাত্র অঙ্গুলি অসংলগ্ন ও বক্র হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ যত বার চেষ্টা করিলেন, ততবারই হস্তদ্বয় বিকৃত হইয়া জল পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ক্রন্দনপূর্ব্বক "মা আমায় তর্পণটাও করতে দিলিনি মা," এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কর্ম্মত্যাগ সমস্তই এই প্রকার। তাঁহার পূজাত্যাগও এই প্রকার; পূজা করিতে গিয়া পুষ্প বা অর্ঘ আপনার মস্তকে দিয়াই বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন আর তখন কে পূজা করিবে? পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য পুষ্প হস্তে লইলে হয় উহা পড়িয়া যাইত নচেৎ হাতের পুষ্প হাতেই

থাকিয়া যাইত, বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যাইত, তখন আর কে পুষ্পাঞ্জলি দেয়?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ মত হৃদয় তিন বৎসর দুর্গাপূজা করিয়াছেন তিন বৎসরই তাহা সমভাবে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। হৃদয়ের তথাপি ইচ্ছা যে, তিনি প্রতি বৎসরই পূজা করেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার অল্প দিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেই জন্য পুনরায় অনুমতি দিতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "হৃদু, তোর যেমন পূজা হইয়াছে, অমন আর কারুর হয় না। তোর পূজর উদ্‌যাপন হয়ে গেছে, আর পূজ,কর্‌বার দরকার নেই, তুই আর পূজ করিস্‌ নি। কেমন জানিস, এক জনের জন্যে যদি বিছ্‌না করে রাখিস্‌ আর সে যদি একবার এসে তাতে বসে, তাহলে আর তার জন্যে বিছ্‌না কর্‌তে হয় না। তুই আর পূজা করিস্‌নি।"

হৃদয় এ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না, বরং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন মামা যাহাই বলুন না কেন, পূজা করিবেন। প্রকাশ্যে কহিলেন "লোকে যে, যত দিন বাঁচে ততদিন পূজা করে, তার কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ তুই যাদের কথা বল্‌ছিস্‌ তাদের কি ঠিক পূজা হয়? মা কি আসেন? সেই জন্যে তারা বার বার পূজ করে। কিন্তু তোর যা হয়েছে অমন আর কারুর হয় না।" হৃদয় এ প্রকার কথায় বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, "মামা যাই বলুন আমি পূজ কর্ব্বোই কর্‌ব।"

কিছুদিন পরে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে হৃদয়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা রাঘব ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাঘব দুর্গোৎসবের সমস্ত খরচ দিতেন। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই যে পূজা কর্‌বি বলিস্‌ এখন কে খরচ দেবে, আর কি করেই বা পূজ করবি?"

হৃদয় উত্তর করিলেন, "আমি যেমন করে পারি কর্‌ব ?" হৃদয় মনে ভাবিলেন, এবার হইতে মথুরের নিকট সমস্ত খরচের টাকা লইবেন। যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নানা প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইলেন যে দুর্গাপূজা আর তাঁহার করা উচিত নহে, কিন্তু কোন কথাই হৃদয়ের মনে স্থান পাইল না। তিনি বলিলেন, "তখন তুমি বলেছ তিন বৎসর পূজ করবি, সেই জন্যেই তুমি এখন আর পূজ করতে নিষেধ করছ। তুমি কেন বল না তুই পূজ কর ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ওরে আমার ইচ্ছেয় কি হয়, মা কালী যা করাবেন তাই হবে, আমি কি কর্‌ব ?"

হৃদয় বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তবে তুমি কেন মা কালীকে বল না ?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "ওরে আমি বল্‌লে আমার কথা কি শোনে ? তাঁর যা ইচ্ছা তাই করাবেন। আমি একটা যন্ত্র বইত নয়।" সেই বৎসর বৈশাখ মাসে হৃদয় মথুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মাকে এবৎসর আনিবেন কি না। মথুর তাহাতে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "মাকে আন্‌বে তার আর কথা কি ? সে ত ভাল কথা।" মথুরানাথ যদি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ বিষয়ে অসম্মতি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন মতেই এরূপ কথা বলিতেন না। যাহা হউক হৃদয় মনে স্থির করিলেন যে, মথুর যখন সাহস দিয়াছেন, তখন পূজার আর কোন আশঙ্কা নাই, সমস্ত খরচ পত্রও তিনি দিবেন। এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে সম্বাদ আসিল যে, প্রত্যহই মথুরানাথের সামান্য জ্বর হইতেছে। ক্রমে সেই জ্বর মজ্জাগত হইল, কিছুতেই তাহার বিরাম হয় না। নানাবিধ চিকিৎসা করিয়াও জ্বর নিবারিত হইল না। হৃদয় মহা উদ্বিগ্ন, তিনি

প্রত্যহই মথুরকে দেখিতে যান, এবং মথুর প্রত্যহই তাঁহাকে অত্যন্ত কাতরভাবে বলেন, "বাবা একবার আসবেন না?" হৃদয় আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে কহিলেন যে, মথুর তাঁহাকে একবার তথায় যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি গিয়ে কি করব? যদি তার রোগটা ভাল করে দিতে পার্‌তুম তাহলে যেতুম।" হৃদয় প্রতিদিন মথুরকে দেখিয়া আসিয়া সম্বাদ দেন আর তাঁহাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করেন,কিন্তু রামকৃষ্ণ কিছুতেই তথায় যাইতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "তুই গেলেই আমার যাওয়া হল।"

এইরূপে সাত আট দিনের জ্বরে মথুরানাথের বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। বৈকাল বেলা তিনটার সময় তাঁহাকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় বেলা পাঁচটার সময় তাঁহার দেহত্যাগ হইল। ঠিক ঐ সময়ে রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি হৃদয়কে মথুরের পরলোক গমনের কথা বলিলেন, "মথুরের দেহত্যাগ হল, মথুরের তেজ অন্নপূর্ণাতে মিশে গেল।" মথুরানাথের সৎকার করিয়া সকলে রাত্রি নয়টার সময় দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের নিকট হৃদয় শুনিলেন, ঠিক পাঁচটার সময় মথুরের দেহত্যাগ হয় উহা ভাবাবস্থায় রামকৃষ্ণ জানিতে পারিয়াছিলেন বুঝিয়া হৃদয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন।

সেই বৎসর দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত। হৃদয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পূজা করিবেনই করিবেন। তিনি আপনার ভাব মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া যদুনাথ মল্লিকের বাটীতে গমন করিলেন। তথায় মামাকে লুকাইয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামকে পত্র লিখিলেন, পূজার সমস্ত আয়োজন করিতে, কিন্তু গোপনে, কারণ মাতুলের ইহাতে মত নাই, তত্রাচও তাঁহারা যতদিন বাঁচিবেন ততদিনই পূজা

করিবেন, এই বাসনা ; পূজার সমস্ত আয়োজন হইলে তাঁহাকে পত্র লিখিলে তিনি দেশে গমম করিবেন। এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে পূর্ব্বে যেমন প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিতেন, এবার আর তাহা না করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির, বার কয়েক শৌচে গেলেন, যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ছট্ ফট্ করিতে করিতে শেষে তাহার সঙ্গে বমনও আরম্ভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো মামাগো, আমায় রক্ষা করগো। ওগো মামাগো আর আমি বাঁচব না গো, মলুম যে গো।" চীৎকার শুনিয়াই রামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ হইলেন, এবং সেই অবস্থায় কহিতে লাগিলেন, "হ্যাঁরে হৃদে! তুই নাকি আমাকে না জানিয়ে পূজ করবি? আমাকে না বলে রাজারামকে চিটি লিখেছিস্, মনে করেছিস্ আমি জান্‌তে পার্‌ব না? বারণ করলুম শুন্‌লিনি। বল্ পূজ কর্‌বিনি! এখনো বল্ পূজ করবি কি না?"

হৃদয় কাতর হইয়া কহিলেন, "না মামা, আমায় রক্ষা কর, আমি মহা অপরাধ করিছি। আমি বলছি আর পূজ করব না, করব না, করব না!" এই বলিতে বলিতে আবার পেট হুড় হুড় করিয়া আসিল, আবার শৌচে গেলেন কিন্তু ঘরের পশ্চিমের গোল বারাণ্ডা অতিক্রম করিতে পারিলেন না এবং উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেবের ভাব ভঙ্গ হইলে তিনি শুনিলেন, হৃদয় ক্রন্দন করিতেছেন আর অতি মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "আর বাঁচিব না মামা, এইবার মলুম মামা।" ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কাঁদিতে

লাগিলেন এবং সকলকে জাগ্রত করিতে লাগিলেন। জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে মন্দিরে চণ্ডীপাঠ করিবার জন্য আগমন করেন, তিনি নিকটেই শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া ঘরের মধ্যে মেঝের উপর বিছানা করিয়া তদুপরি হৃদয়কে শয়ন করাইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন এবং হৃদয়কে কহিতে লাগিলেন, "মা কালীর ইচ্ছে নয় যে, তুই আর পূজ করিস্। তা তুই আমাকে না জানিয়ে কেন রাজারামকে চিঠি লিখ্‌লি?" হৃদয় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন যে, এমন কর্ম্ম আর কখন করিবেন না। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকট বসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, যখনি যে কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে না জানাইয়া যেন আর কোন কার্য্য না করেন। হৃদয়ও তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এইরূপ কথা কহিতে কহিতে হৃদয় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অল্প পরে জ্ঞানানন্দ একজন ডাক্তার আনয়ন করিলেন। ডাক্তার আসিয়া হৃদয়কে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, "আর কোন ভয় নাই।" রামকৃষ্ণদেব তাঁহার কথায় সুস্থির হইলেন। হৃদয় পরদিন বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রার পর একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। উঠিয়াই রাজারামকে পত্রদ্বারা পূজার আয়োজন করিতে নিষেধ করিলেন।

ভক্তসমাগম।

মথুরানাথের পরলোকের পর হইতে শম্ভুচরণ অতি প্রীতিসহকারে রামকৃষ্ণদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে 'গুরুজি' বলিয়া সম্বোধন করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিতেন, "কে কার গুরু? আমি বলি তুমি আমার গুরু।" তত্রাচ শম্ভুচরণ তাঁহাকে ঐ রূপ সম্বোধন করিতেন।

কেশব চন্দ্র এখন রামকৃষ্ণদেবের নিকট ঘন ঘন আগমন করিতেছেন। যখনই আগমন করেন তাঁহার সঙ্গে অনুচরবর্গও অনেক থাকে, সুতরাং কেবল কতকগুলি তত্ত্ব কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা নির্জ্জনে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতেন তাঁহারা তত্ত্ব কথা ব্যতীত আরও কিছু বিশেষ বস্তু প্রাপ্ত হইতেন। রামকৃষ্ণদেব সেই জন্যই কেশবকে মধ্যে মধ্যে একাকী আসিতে অনুমতি করিতেন। কিন্তু কেশবের তদ্রূপ সুবিধা হইয়া উঠিত না। একদিন রামকৃষ্ণদেব হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। তখন কেশবের নিকট প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েক জন কেশবের ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় যাইয়া কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেশবের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ভগবৎ কথা কহিতে কহিতে ক্রমে তাঁহার ভাবের মত ঘোরের অবস্থা হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ কেশব তোমার এখনো অবিদ্যাপাশ সব যায় নি, তাই ভাঙ্গা ঘরের চালের ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতর যেমন সূর্য্যের একটু আলো আসে, সেই রকম তোমার ভেতরে চৈতন্য-সূর্য্যের একটু আলো আস্‌ছে মাত্র। বুঝ্‌লে?"

কেশব উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বুঝ্‌তে পেরেছি।" তৎ-

পরে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেশবকে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, আর কেশব চন্দ্র প্রাণ পূরিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শেষে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ কেশব কৃষ্ণ, রাম, কালী এ সকল রূপ কেমন জান, যেমন জলের তরঙ্গ। সচ্চিদানন্দ সাগরে এক একটী তরঙ্গ। বুঝ্‌তে পেরেছ ?"

কেশব উত্তর করিলেন "আজ্ঞে হাঁ পেরেচি !" কেশবের বংশের কুলগুরু চৈতন্যসম্প্রদায়ের গোস্বামী এবং বংশ পরম্পরায় চৈতন্য-দেবের ভক্ত। যিনি যতই পরিবর্ত্তিত হউন না কেন, বংশগত সংস্কা-রের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ প্রায় ঘটে না। সেই জন্য বাল্যকাল হইতেই চৈতন্যদেবের প্রতি কেশবের কেমন একটু শ্রদ্ধা ছিল। উহা মনের কোন্ কোণে লুক্কায়িত ছিল কেশবচন্দ্রও স্বয়ং তাহা সকল সময় বড় খুঁজিয়া পাইতেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাহা আজ ধরা পড়িল। তিনি কহিলেন, "দেখ কেশব, রাম অবতারে রাজ-নীতি, যুদ্ধ, সতীর সতীত্বরক্ষা, এই সব। কৃষ্ণ অবতারে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা ইত্যাদি। কিন্তু চৈতন্য অবতারে বড় নিষ্ঠা-কাষ্ঠা, না ?"

কেশব একটু উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যা মশাই তাই বটে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কিন্তু তোমারা যে অবতার মান না, তার কি ?"

কেশব চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মশাই, আমরা ত মান্‌তে চাইনি, আপনি তা বলে ছাড়েন কৈ ? আপনি যে মানিয়ে নিচ্চেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা তুমি সাকার মূর্ত্তিকে কাঠমাটি মনে কোরো না। সচ্চিদানন্দ-ঘন বোলে জ্ঞান করো। যেমন এই জল

জমে বরফ হয়, সেই রকম মনে করবে, তাহলে আর কোন গোলযোগ হবে না। বুঝলে ?"

কেশব উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে।" তাহার পর রামকৃষ্ণদেব কেশবকে দুই একটি সাংকেতিক কথায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিলেন, তাহা কেবল কেশবই বুঝিলেন, আর কাহারও তাহা বোধগম্য হইল না দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে কহিলেন, "কালার কথা বোবায় বোঝে অন্যের লাগে ধাঁধা। এরা কি বুঝবে ? এরা সব ভূত।" প্রতাপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনরায় কহিলেন, "আর, ইনি ভূতের মধ্যে ভদ্দর!" কেশব হাসিতে লাগিলেন।

প্রতি দিন তাঁহার নিত্য নূতন কথা কেশবের দেহে যেন নব-জীবন সঞ্চারিত এবং হৃদয়ে নবনব ভাব প্রস্ফুটিত করিতেছে। তাঁহার নিরাকার উপাসনা ক্রমে সাকারে পরিণত হইয়া কেবল 'মা মা' বলিয়া তিনি প্রকৃত সন্তানভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে শিখিয়াছেন, উপাসনা মন্দিরে মা, সম্বাদ পত্রে মা, বক্তৃতায় মা, এখন কেশব রাম-কৃষ্ণদেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বত্র 'মাকে' প্রচার করিতে-ছেন। তাঁহার বক্তৃতা কালে শ্রোতৃবর্গ মনে করেন, কেশব যেন মা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়াই বক্তৃতা দিতেছেন। এক দিন রাম-কৃষ্ণদেব 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ,' এই সম্বন্ধে কেশবকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়া পরে 'ভাগবৎ ভক্ত ও ভগবান, গুরু কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনই এক, একে তিন', এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব এ সব বুঝলে ? কেশব কহিলেন "আজ্ঞে হাঁ।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আরও কিছু বলব শুনবে ? কিন্তু শুনলে আর তোমার দলটী থাকবে না, দলটী ভেঙ্গে যাবে।" কেশবচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না; তিনি চমকিত হইয়া করজোড়ে কহিলেন, আজ্ঞে

আর থাক্, মশাই” কেশব লোকৈষণা ত্যাগ করিতে পারিলেন না, সুতরাং রামকৃষ্ণদেবও আর অধিক মাত্রায় কিছু বলিলেন না।

এক দিবস কেশব প্রায় দুই শত লোক সমভিব্যাহারে আগ্নের পোতযোগে দক্ষিণেশ্বরে বেলা দুইটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব দুই একটী লোকের সহিত আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন। কেশবের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সেই ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; অপর দিক হইতে কেশব ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুচরবর্গ আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কেশব করজোড়ে প্রণাম করিলে রাম-কৃষ্ণদেবের ভাব হইয়া পড়িল এবং সেই ভাবের অবস্থায় মহা ওজস্বিনী কথা সকল বলিতে লাগিলেন। মধ্যে এক একবার থামিয়া কেবল কেশবকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “বুঝেছ?” আর কেশব তদুত্তরে “আজ্ঞে হঁ্যা”; বলিতেছেন। আবার সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আত্মতত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। সকলে স্তম্ভিত, চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সেই তত্ত্বপ্রবাহ শুনিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল, শীতকাল, তথাপি কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল; এক ঘণ্টা অতীত হইল তথাপি সেই অমিয় প্রবাহের বিরাম নাই; দেড় ঘণ্টা হইল তথাপি বিরাম নাই। অবশেষে কহিলেন, “ভাবের উদয় হওয়া চাই কেশব। ভগবান্ ভাবগ্রাহী।”

কেশব কহিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি দেখিছি, লোকের মনে সময়ে সময়ে বেশ ভাবের উদয় হয়, কিন্তু সেটা থাকে না, আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার, যে সাংসারিক ভাব সেই সংসারিক ভাব এসে পড়ে।”

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “কেশব তুমি এতবড় বক্তা, এইবার তুমি কিছু ঈশ্বরীয় কথা বল আমি শুনি।”

কেশব কহিলেন, "আজ্ঞে আমি ত আর কামার দোকানে ছুঁচ বিক্রি কর্‌তে আসিনি। আপনাকে আবার ঈশ্বরীয় কথা কি বল্‌ব? আপনি বলুন আমি শুনি।"

পরদিন কলিকাতার কোন স্থলে কেশবের বক্তৃতা হইবার কথা ছিল; কেশব রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেছেন শুনিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক রামকৃষ্ণদেব কি বলেন এবং তিনি যাহা বলেন কেশব চন্দ্র পরদিন বক্তৃতায় ঠিক তাহাই বলেন কিনা জানিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছেলেন। পরদিন তাঁহারা কেশবের বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই কেবল আপনার ভাবে বিবৃত করিয়া বলিলেন।

'সুলভ সমাচার' নামক সংবাদ পত্র খানি কেশবের দ্বারাই পরিচালিত। কেশব সম্প্রতি তাহাতে রামকৃষ্ণদেবের উক্তি সকল প্রকাশ করিতে এবং রামকৃষ্ণদেবের বিষয়ও কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লোকে তৎপাঠে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। মনোমোহন মিত্র ও রামচন্দ্র দত্ত দুই মাসতুত ভাই, নিবাস কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া বাজারের নিকট। দুই জনের বাটী অতি সন্নিকট, প্রত্যহই পরস্পর দেখা শুনা হয়। একদিন সুলভ সমাচার পাঠ করিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংস দেখিবেন। সন্ন্যাসী, পরমহংস, ছাই মাখা, গেরুয়া পরা বা জটা কৌপিনধারী ইহাই তাঁহাদের ধারণা। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তাহাতে অল্প আঘাত করিলেন। শব্দ শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব স্বয়ং আসিয়া তাহা মুক্ত করিলেন এবং আগন্তুক দুই জনকে যত্ন সহকারে আপনার নিকট বসাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব একজন

সহজ সাধারণ লোকের মত বাহ্যিক ছিটা ফোঁটা জটাজুট আড়ম্বরাদি বর্জ্জিত। এ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের নিকট ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোকরাই অধিক আসিতেন। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং সানন্দে আপনার ভাগিনেয় হৃদয়কে কহিলেন, "ওরে হৃদু, এরা ব্রাহ্মসমাজের লোক নয় রে। তুই আয় এদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তোর হাতটা দেখা না।" রামচন্দ্র হৃদয়কে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, এখন জ্বর নাই। তৎপরে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। সে দিন প্রায় সন্ধ্যা হয় এমন সময় তাঁহারা বিদায় লইতে উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একটু দাঁড়াও মার প্রসাদ খেয়ে যাও।" এই বলিয়া কিছু প্রসাদ ও জল আনিয়া দুই জনকে দিলেন। তাঁহারা প্রসাদ খাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় লইলেন; রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার এস, আবার এস।" এই স্নেহমাখা ব্যবহার আজ দুই জনের মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিল। এত আত্মীয়তা! এ প্রকার আত্মীয়তা কৈ এ পর্য্যন্ত ত কোথাও পাওয়া যায় নাই, ইনি যে ভগবানের উপর অহৈতুক ভালবাসার কথা বলিলেন তা ইঁহারই ত সেই রূপ ভালবাসা আমাদের উপর দেখিতেছি—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে এবং পরস্পর ইহাই বলাবলি করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন।

সাংসারিক আদান প্রদানের ভালবাসাই এতাবৎ কাল আস্বাদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহারা অকারণ ভালবাসার কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইয়া তাহারই প্রভাবে অদ্ধ দুই জনেই মুক্তির পথে আরূঢ় হইলেন। দুই জনেই জীবিকার্জ্জনের জন্য পরের দাসত্ব করেন, সপ্তাহে একদিন মাত্র অবসর পান, সুতরাং সেই দিন দুই জনে আবার সেই অহৈতুক প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন, আর সকাল সন্ধ্যা

দুইজনে একত্রে বসিয়া সেই অপূর্ব্ব ব্যক্তির অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ ও অপূর্ব্ব ব্যবহারের কথাই কহিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে যে সকল কথা শুনিয়া আসেন তাহারই চর্চ্চা করেন, কাম কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে পরমার্থ লাভ হয় না। সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া হয় ত কোন দিন 'সংসারই ভগবৎপথের কণ্টক' বলিয়া ফেলিলেন। মহিলাগণ হয় ত তাঁহাদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া অবধি তাঁহাদের মনের ভাবান্তর দর্শন করিয়া একটা মহা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইলেন. পাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়া তাঁহারা শেষে সংসার ত্যাগ করিয়াই ফেলেন। প্রতিদিন বাহিরে যেমন পুরুষদের সৎচর্চ্চার সভা আরম্ভ হয়, অমনি মহিলাগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এক দিন মিত্রজ দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার পিসীমাতা আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন ও দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিষেধ করিলেন। মিত্রজ মহাশয় যে প্রাণপ্রস্থ ভালবাসার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাহার স্রোতে পিসীমাতার সমস্ত বাধা ভাসিয়া গেল। ভ্রাতৃদ্বয় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালকের মত কহিলেন. "একজন ভক্ত এখানে আস্‌তে ভালবাসে, কিন্তু তার পিসীমা বড় রাগ করে, আস্‌তে মানা করে। যদি সে পিসীমার কথা শুনে এখানে আর না আসে? তাই ভাব্‌চি।"

মনোমোহন আর থাকিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন. প্রতিজ্ঞা করিলেন, "প্রাণ গেলেও আর কারুর মানা শুন্‌ব না, এঁর চেয়ে আপনার লোক আর কে আছে? ইনি অন্তর্যামী ইনিই ভগবান্।" দেখিতে দেখিতে আরও অনেক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন প্রতি শনিবার বৈকাল বেলা আর

রবিবার সমস্ত দিন অসংখ্য লোক আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করেন।

আর এক দিন দুই জনে দক্ষিণেশ্বর যাইবেন, কিন্তু মনোমোহনের একটী কন্যার অত্যন্ত জ্বর। তাঁহার পত্নী সেই জন্য আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কন্যার এত জ্বর অবস্থায় ফেলিয়া অন্যত্র যাওয়া উচিত নহে,আর একটা দিন যদি দক্ষিণেশ্বরে নাই যাওয়া হয় তাহাতে কি দোষ হইতে পারে—ইত্যাকার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মনোমোহন কোন আপত্তি না শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব আর এক জনকে বলিতেছেন—"একজন লোক এখানে এসে ঈশ্বরীয় কথা শুনতে ভাল বাসে, কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বড় নারাজ। যদি সে স্ত্রীর কথা শুনে এখানে না আসে তা হইলে তার ধর্ম্মলাভ হবে না, এই ভেবে মনটা কেমন কচ্চে।" মনোমোহন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আপনার শুভাদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মনে মনে রামকৃষ্ণ চরণে শরণ লইলেন।

ইঁহাদের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন পাকা ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি, এক ইংরাজ সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি। রামচন্দ্র তাহার বন্ধু সুরেন্দ্রকে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, সুরেন্দ্র হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অনেক বুঝাইবার পর সুরেন্দ্র সম্মত হইলেন, কহিলেন,"আচ্ছা যাব, কিন্তু তোমার সাধু যদি বাজে বুজরুকি করেন ত তাঁর কাণ মলে দিয়ে আসব।"

এই সময়ে সুরেন্দ্রের নানা কারণে প্রাণে বড় যাতনা, এমন কি আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে এক প্রকার মনস্থই করিয়াছেন। সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঘরে অনেক লোক, সুরেন্দ্র ঘরের এক পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। শুনিলেন,

রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, "দেখ মানুষে কেন বাঁদর ছানার মত হয়? কেন বেরালছানার মত হয় না? দেখ বেরালছানা মা যেখানে রাখে সেই খানে পড়ে পড়ে কেবল মেউ মেউ করে। ক্ষিদেই পাক্ আর অন্য কোনরূপ কষ্টই হোক্ তার সেই এক বুলি, পড়ে পড়ে 'মা' 'মা' করা। আর বাঁদর ছানাগুলো মাকে আপনি আঁকড়ে ধরে থাকে। মা নাবালেও নাব্‌বে না। এ গাছ থেকে ও গাছে মা লাফাচ্ছে, সেও জোরে আঁকড়ে ধরে আছে। সময়ে সময়ে মা তাইতে বিরক্ত হয়ে ছানাটাকে আছাড়ে ফেলে দেয়।" সুরেন্দ্রনাথ শুনিয়া ভাবিলেন, "বটেই ত আমিও ত ঠিক বাঁদর ছানার মত মাকে ঐরকম জ্বালাচ্চি। আজ থেকে আর আমার মনের মত কোন বিষয়টি হচ্চে না বা হোলো না বলে জগন্মাতার মঙ্গল উদ্দেশ্যে অবিশ্বাস করে অভিমানে আত্ম হত্যা করবার সংকল্প করবো না। তিনি যেমন রাখেন তেমনি থেকে পড়ে পড়ে "মা" "মা" করবো—তার পর "মা" যা করেন!"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "মা যখন ধরে নিয়ে যায় তখন আর পড়ে যাবার ভয় থাকে না। বর্ষার সময় পেছল আলের ওপর দিয়ে বাপ বেটায় যাচ্ছে। এখন ছেলে যদি বাপের হাত ধরে যায়, তাহলে পা পিছ্‌লে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে তাহলে সে ভয় থাকে না। সেই রকম মা আনন্দময়ীর ওপর বিশ্বাস করে তাঁর ওপর সব ভার দিয়ে দিলে আর কোন ভয় থাকে না, কোন গোলমাল থাকে না।"

সুরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও তাহার সহিত সমস্ত দুশ্চিন্তাও ত্যাগ করিলেন। মা আনন্দময়ীর রাঙা পাদ পদ্মে শরণ লইলেন—একেবারে মা আনন্দময়ীর সন্তান হইয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার সমস্ত প্রকৃতির যেন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল,

হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চারিত হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। রামকৃষ্ণদেবের বাণী তাঁহার কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ সেই কাথাবার্ত্তা শুনিবার পর, সকলে যখন বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন রামকৃষ্ণদেব রামলালকে ডাকিয়া সকলকে মা কালীর প্রসাদ দিতে অনুমতি করিলেন। এখন সুরেন্দ্রের হৃদয় শ্রদ্ধায় আর্দ্র, সুতরাং বিদায় লইবার সময় রামকৃষ্ণদেবকে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, অমনি তিনি কহিলেন, "আবার এস।" এই 'আবার এস'র ভিতর কি যাদু আছে, যাঁহাকে বলেন তাঁহাকে পুনরায় আসিতেই হইবে নতুবা নিস্তার নাই। পথে আসিয়া সুরেন্দ্র বন্ধুদের কহিলেন, "ভাই কাণ মল্‌তে এসে কাণ মলা খেয়ে গেলুম। এমন ব্যাপার তাকি ছাই তোমাদের কথায় বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। ইনি যে অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ তা কেমন করে জান্‌ব? এখন মনে হচ্ছে ভাই বেঁচে সুখ আছে।" এই বলিয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত কথা আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ, অনুপূর্ব্বিক কহিলেন। বন্ধুগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

সুরেন্দ্রের মনের ভাব এইরূপে প্রথম দর্শনেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের নিকট তদবধি যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে এত ভগবদ্ভক্তি ভালবাসার উদয় হইয়াছিল যে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইত। রামকৃষ্ণদেব সুরেন্দ্রকে সুরেশ বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অপরের নিকট বলিতেন—"কেমন সরল দেখেছ?"

একদিন সুরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট উপস্থিত সে ঘরে আরও অনেকে বসিয়া আছেন এবং রামকৃষ্ণের সহিত নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলিতেছে—এমন সময় রামকৃষ্ণ একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ

একটু পুরুষত্ব থাকা চাই।" সুরেন্দ্র এই কথাটি আপনার ছাঁচে ঢালিয়া লইলেন, ভাবিলেন, "ঐ রোগেই ত মরেছি, আবার পুরুষত্ব কেন ?"

রামকৃষ্ণ পুনরায় কহিলেন, "শৃগাল কুকুরের পুরুষত্ব নয় যাতে মানুষ হীন হয়ে পড়ে। অর্জ্জুনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধোর্ব সেটা কর্‌ব, প্রাণপণ, ছাড়্‌ব না। তারই নাম পুরুষার্থ, মনুষ্যত্ব।" এখন সুরেন্দ্র নিজের ভ্রম বুঝিলেন।

রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। রামের ও সেই জন্য চৈতন্যদেবের উপর শ্রদ্ধা। তাই রামকৃষ্ণ তাহাকে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতে কহিলেন। রামচন্দ্র উহা পাঠ করিতে করিতে রামকৃষ্ণদেবের ভাবসমূহ তাহাতে মিলাইয়া পাইলেন ; আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি নিবিষ্ট চিত্তে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাকাইয়া আছেন এমন সময় রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এত তাকিয়ে কি দেখ্‌ছ ?"

রামচন্দ্র কহিলেন, "আপনাকে দেখ্‌ছি।"

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় ?'

ভক্ত কহিলেন, "আপনাকে সেই চৈতন্যদেব বলেই মনে হয়।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বামনীও ঐ কথা বল্‌ত।" রামচন্দ্রকে তিনি ঐরূপ বলিলে রামচন্দ্র তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, তিনি কাহাকেও মন্ত্র দেন না। ভক্ত অকুলপাথারে পড়িলেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বপ্নে এক মন্ত্র পাইয়া তাহাই জপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রামকৃষ্ণদেবকে আসিয়া সেই কথা জানাইলেন। তিনি কহিলেন, "অতি ভাগ্যবলে স্বপ্নে দীক্ষা পায়।"

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার মনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু আপনার পূর্ব্ব স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন না এই অভিমানে এক রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। তাঁহার বন্ধুরা রামকৃষ্ণদেবকে জানাইলেন যে সে আবার পূর্ব্বের মত মন্দলোকের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আচ্ছা এখনো ভোগবাসনা আছে দিন কতক ভোগ করে নিগ্, এর পরে ওসব কিছুই আর থাক্‌বে না—সে নির্ম্মল হয়ে যাবে।"

তাহার পর রবিবারে সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া একটু সলজ্জভাবে রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে অল্প দূরে যাইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি গো চোর-টীর মত অমন দূরে গিয়ে বস্‌লে কেন? এগিয়ে কাছে এস।" সুরেন্দ্রনাথ নিকটে আসিলে রামকৃষ্ণদেবের ভাব হইয়া পড়িল এবং তদবস্থায় তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, লোকে যখন কোথাও যায় তখন মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় না কেন। মা সঙ্গে থাক্‌লে অনেক মন্দ কাজের হাত থেকে নিস্তার পায়।" সুরেন্দ্রনাথ মহা অভিমানী ব্যক্তি, রামকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন এইবার বুঝি তাঁহার অন্তরের সমস্ত কথা সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার লজ্জার আর পরিসীমা থাকিবে না। তাঁহার মনে এই আশঙ্কা জন্মিবামাত্র অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণও আর কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তিনি যতটুকু বলিলেন তাহাতেই সুরেন্দ্রের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার রোগের কোন প্রতি-কার করিতে পারেন নাই। অদ্য রামকৃষ্ণদেবের কথায় তাঁহার প্রকৃত ঔষধি প্রাপ্ত হইলেন, রোগমুক্ত হইবার উত্তম পথ পাইলেন।

দিন দিন রামকৃষ্ণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার নিকট যাতায়াতও ঘন ঘন করিতে লাগিলেন। এক দিন আপনার কার্য্যস্থানে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু কার্য্য এখনও বিস্তর রহিয়াছে সে সমস্ত ত্যাগ করিয়াই বা কেমন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন, এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহার সেই দিদৃক্ষা এতই বলবতী হইয়া উঠিল, যে ভাবিলেন, "চাকরী থাক্ বা যাক্ দক্ষিণেশ্বরে যাবুই," এবং তৎক্ষণাৎ কার্য্যস্থল ত্যাগ করিয়া এক দ্রুতগামী শকটে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণদেব কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এসেছ বেশ হয়েছে। আজ তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে বড়ই ইচ্ছে হয়েছেল, তাই তোমাকে দেখতে কল্‌কেতায় যাচ্ছিলুম।"

সুরেন্দ্র আশ্চর্য্য হইলেন ভাবিলেন, "এ কি? এঁর আমাকে দেখবার ইচ্ছে আর আমারও সেই জন্যে এঁর কাছে আস্‌বার এত ইচ্ছে। নিশ্চয় এঁর্ ইচ্ছেতেই এই সব খেলা হচ্ছে।"

সুরেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া করযোড়ে কহিলেন, "তবে যাচ্ছেলেন ত চলুন, একবার অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূল দিয়ে আসুন।" রামকৃষ্ণদেব তখনি সম্মত হইয়া সুরেন্দ্রের সহিত তাঁহার বাটী গমন করিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহাকে আপনার বাটীতে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা ও তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিলেন।

সুরেন্দ্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাঁহার আর কোন প্রকার ভোগবিলাসে মন যায় না, কেবলমাত্র রামকৃষ্ণদেবের দর্শন ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিলেই যেন মনের তৃপ্তি জন্মে। দিন

নাই, ক্ষণ নাই, সময় নাই, অসময় নাই যখনি তাঁহার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শনের অভিলাষ হয় তখনি তাঁহার স্বরূপ সম্মুখে দেখিতে পান আর আনন্দে মাতিয়া উঠেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবার পূর্ব্বাবধি বীরভাবাপন্ন সুরেন্দ্রের কারণ পানে আসক্তি ছিল। রামচন্দ্র বৈষ্ণব প্রকৃতির লোক, একে ত তাঁহার ঐ বিষয়ে কঠোর বীতরাগ, তাহার উপর আবার পাছে সুরেন্দ্রের ঐরূপ কার্য্যে ঠাকুরের নিন্দা হয়—কেন না সুরেন্দ্র এখন ঠাকুরের ভক্ত পরিবার মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত—অতএব প্রত্যহই তাঁহাকে উহা ত্যাগ করিতে বলেন। সুরেন্দ্র অবশেষে তাঁহাকে কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি এত পেড়াপীড়ি কেন কর? যদি ত্যাগ করবার দরকার হতো তা হলে পরমহংস মশাই কি তা বলে দিতেন না? তাঁর অবিদিত কি আছে?"

রামচন্দ্র কহিলেন, "তবে চল তাঁর কাছে, তিনি নিশ্চয় তোমায় মদ খেতে নিষেধ করবেন।"

সুরেন্দ্র কহিলেন, "তা বেশ কথা, চল তাঁর কাছে যাওয়া যাগ। কিন্তু তুমি গিয়ে তাঁকে কোন কথা বলতে পাবে না। তিনি অন্তর্যামী, কোন্ কথাটা তাঁর কাছে আমরা চাপা রাখতে পেরেছি? যদি মদ ছাড়বার আবশ্যক হয় ত তিনি নিজে বল্‌বেন তার আর ভুল নেই, আর আমিও মরি আরবাঁচি ওটা তখনি ছেড়ে দেব। তুমি কিন্তু কোন কথা কইতে পাবে না।" এই প্রকার দুই জনে পরামর্শ করিয়া রামকৃষ্ণদেরের নিকট গমন করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি বকুলতলায় ভাবস্থ বসিয়া আছেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ভাবস্থ থাকিয়াই কহিতে লাগিলেন, "অ সুরেশ (রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সুরেশ বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং সেই জন্য তাঁহার বন্ধুগণও ঐ নামেই

তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন) মদ বলে মদ খাবে কেন, মা কালীকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ খাবে। কিন্তু বেশী নয়, যেন পা না টলে আর মন না টলে। প্রথম কারণানন্দ হবে, তারপর তাই থেকে ভজনানন্দ হবে।" সুরেন্দ্র তদবধি তদ্রূপ অনুষ্ঠানই করিতেন। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিঞ্চিৎ কারণ মা কালীকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ পান করিতেন, কিন্তু কারণানন্দ না আসিয়া তাঁহার ভজনানন্দের উদয় হইত। সেই সময়ে তাঁহার নয়নদ্বয়ে অনর্গল অশ্রুধারা, মুখে মধ্যে মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী করুণ স্বরে মা মা রব, মধ্যে মধ্যে নিস্পন্দ ধ্যানেমগ্ন অবস্থা দেখিয়া নাস্তিক দর্শকের হৃদয়েও ভগবদ্ভাবের সঞ্চার হইত। এবং এই সময় তিনি ভগবৎ কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা কহিতে বা শুনিতে ভালবাসিতেন না।

কেশব সংবাদ পত্রে প্রতিবারেই কিছু না কিছু রামকৃষ্ণদেবের উক্তি অথবা সংবাদ প্রচার করেন। তাঁহার লেখনী দ্বারা কত লোকের যে উপকার হইয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় ৺কৃষ্ণরাম বসুর বংশোদ্ভব পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বসু পুরুষানুক্রমে উড়িষ্যা দেশের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। রামকৃষ্ণদেবের কথা কেশবের সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া কলিকাতায় আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইতে লাগিল। কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে তাঁহার বাটীতে একজন ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। ইঁনি তাঁহার পুরোহিত বংশীয় এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিয়া অন্তরে ভগবৎ ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব সঞ্চয় করিতে ছিলেন। ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট এতই অপার আনন্দ পাইতে লাগিলেন যে একা তাহা সম্ভোগ করা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার

বন্ধু বসুজ মহাশয়কে তৎপর কলিকাতায় আসিয়া সেই প্রেমমূর্ত্তি রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে পত্রদ্বারা আহ্বান করিলেন। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বসুজ মহাশয়ের রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রপাঠ সমস্ত বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন; এবং পরদিন দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। আজ সেই প্রকোষ্ঠে আর লোক ধরে না, বাহিরেও অনেক লোক স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব কথা সকল শ্রবণ করিতেছেন। কেশবচন্দ্রের আজ এখানে মুড়ী খাইবার নিমন্ত্রণ, সেই জন্য আজ এত লোক সমাগম। কেশব রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট, অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া আছেন এবং তাঁহার অমৃতময়ী ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিতেছেন। অতঃপর মুড়ী খাইবার জন্য সকলে আহুত হইলে ক্রমে সকলেই প্রাঙ্গনে যাইলেন, রামকৃষ্ণদেব ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করিয়া বসুজ মহাশয়কে নিকটে ডাকিলেন, এবং তিনি নিকটে আসিলে প্রেমসিক্তস্বরে কহিলেন, 'তোমার কি কথা আছে বল।'

বসুজ মহাশয় কহিলেন, "মশাই ভগবান্ কি আছেন?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁ ভগবান্ আছেন বই কি।"

বসুজ আবার বলিলেন, "তবে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় কি?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তাঁকে আপনার ভেবে ডাক্‌লে তিনি দর্শন দেন। এক ডাকে দেখা না পেলে ভাবতে নেই যে তিনি নেই। দিনের বেলা নক্ষত্র দেখা যায় না, তা বলে কি আকাশে নক্ষত্র নেই বল্‌বে?"

বলরাম কহিলেন, "তবে তাঁকে এত ডাকি কিন্তু তাঁর দর্শন পাইনি কেন?"

রামকৃষ্ণদেব মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আপনার সন্তান সন্ততিতে যেমন আপনার জ্ঞান আছে তাঁকে সেই রকম আপনার ভেবে ডাক কি?" সরল সদাশিব বসুজ এই কথা শুনিয়া আপনার অন্তরে ডুবিলেন, হৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে ভগবানকে ঠিক্ সেরূপ আত্মীয় ভাবে ডাকেন নাই, কহিলেন, "আজ্ঞে না, সে রকম ভাবে তাঁকে ডাকিনি।"

ঠাকুর আবার সেই মন-আলোকরা হাসি হাসিয়া কহিলেন, "আপনার হতেও আপনার ভেবে তাঁকে ডাক, নিশ্চয় বল্‌ছি তিনি ভক্তবৎসল, দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারবেন না। মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি এগিয়ে আসেন। মানুষ যদি এক পা ঈশ্বরের দিকে এগোয় তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই?" বসুজ মহাশয়ের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, ভাবিলেন, "তাইত এমন কথা ত আর কখন শুনিনি তিনি এতই আত্মীয়, তাঁর চেয়ে আপনার জন আর কেউ নেই! তবে এত দিন তাঁকেও ভুলে ছিলুম! মানুষ তাঁকে ডাক্‌বার আগে তিনি তার কাছে এগিয়ে আসেন!" আবার ভাবিতেছেন, "জীবের প্রতি তাঁর এত দয়া বলেইত জীবের জন্যে দেহ ধারণ করেন—ইনিই বা কে? কি আশ্চর্য্য, এঁকেই সেই পরম দয়াল বলে কেন মনে হচ্ছে। ইনিই ত দেখছি ডাক্‌বার আগে এগিয়ে এসেছেন। আবার আমার প্রাণ যে এঁকে মহা আত্মীয় বোলে দিচ্ছে।" সকলে আহূত হইয়া আহার করিতে গেলেন, বসুজও গেলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ মন এক রামকৃষ্ণদেবে মুগ্ধ, চক্ষু তাঁহার দিকেই তাকাইয়া রহিল, শ্রুতিপথে তাঁহার কথাই বাজিতেছে এবং মনের ভিতর তাঁহার মূর্ত্তিই বিরাজ করিতেছে। আহারাদির পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যাইবার জন্য রামকৃষ্ণদেবের নিকট বিদায়

লইয়া প্রস্থান করিলেন, বসুজও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বিদায় মাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই অপূর্ব্ব মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'আবার এসো।' বসুজ কহিলেন,"আজ্ঞে হ্যাঁ আসব বই কি।" মনে মনে বলিলেন, "রাত্তিরটা পোয়ালেই আসব; আর কোথায় যাব, রোজ আসব।"

গভীর চিন্তামগ্ন বসুজ বাটী আসিলেন। আজ রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহার মনে এক প্রবল প্রবাহ সমুত্থিত। আজ তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন, রামকৃষ্ণদেবের কথা ব্যতীত আর অন্য কোন চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইতেছে না, তাঁহার সেই ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত সেই কথাই কহিতেছেন আর সেই চিন্তাই করিতেছেন। পরদিন প্রত্যুষে আবার দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ একাকী রহিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে এসেছ বেশ হয়েছে। বোস জিরোও। তোমার কথাই মনে হচ্ছিল। কোথায় বাড়ী।"

বলরাম কহিলেন "আজ্ঞে বাগবাজারে।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এই এতটা পথ হেঁটে এসেছ?"

বলরাম উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তাহার পর রামকৃষ্ণদেব তাঁহার কয়টী পুত্র কয়টি কন্যা সংসারে কে কে আছে আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় লইয়া কহিলেন, "ওগো মা বলেছেন, তুমি যে আপনার জন; তুমি যে মার একজন রসদ্‌দার; তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে। কিছু কিনে পাঠিয়ে দিও।" বলরাম করযোড়ে কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" রামকৃষ্ণদেব নিষ্ঠাবান্ লোকদের বলিতেন, "এখানে আস্‌বার সময় যা হোগ্ এক পয়সার কিছু কিনে এনো। দেবতার স্থানে শুধু হাতে আস্‌তে নেই।" আবার যাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ

প্রতিবার আসিবার সময় এক একটী পয়সা খরচ করাও বিশেষ অসু-বিধা তাহাকে বলিতেন, "দেখ্ তুই রোজ রোজ আস্‌বি তা রোজ একটা করে পয়সা কেন খরচ করিস্। এক কাজ করিস্ এক পয়সার সুপুরী, কিনে কেটে রাখিস্, আস্‌বার সময় তাই দুটী দুটী আনিস্।"

বলরাম পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাহা পাঠাইবেন তাহা স্বয়ং ক্রয় করিবেন—ইহাই ভাবিতেছেন আর আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ইনি কে? এত মিষ্টি ব্যবহার কৈ মানুষের ত কখন দেখিনি। কত দেশে কত শত সাধু দেখলুম, কত যোগী কত মহান্ত দেখলুম, এ ভাব ত কোথাও দেখিনি। আবার চৈতন্য মহা-প্রভুর মত ভাবসমাধিও মুহুর্মুহু হয়। এত অনন্ত ঈশ্বরীয় ভাবও ত কারুর দেখিনি! না মানুষ নয়, মানুষ নয়, এ সেই মহাপ্রভুই উদয় হ'য়েছেন। ব'লেছিলেন আবার আসবেন, তাই আবার এসেছেন। আর গীতায় ত ভগবান্ বলেছেন, যখনি ধর্ম্মের গ্লানি হয় তখনি তিনি আসেন। এ সব তাঁরই লীলা। কত জন্মের পুণ্যফলে আজ ভগবানের দর্শন পেলুম। তাই বটে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন যদি মানুষ এক পা এগোয়। আর এইতো তিনি এগিয়ে বসে আছেন আর যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছেন।" আবার মনে হইতেছে, "না, এমন সত্তার বিশ্বাস করলে চলবে না। রোজ আস্‌তে হবে, এঁর সকল দিক দেখতে হবে, বাজিয়ে নিতে হবে। আগা গোড়া সব জানতে হবে, অবতার ত একটুমানি কথা নয়, নাড়ী নক্ষত্রের সমস্ত লক্ষণ না জানলে, এমন হঠাৎ বিশ্বাস ঠিক নয়।" এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন স্নান আহারাদি করিলেন। তৎপরে স্বয়ং বাজারে যাইয়া উৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই সমস্ত

দ্রব্য সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলেন। চেষ্টা করিলেও মন আর অন্যদিকে যায় না, মন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই বালকভাবাপন্ন রামকৃষ্ণদেবের প্রতিই ধাবিত হইতেছে। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় সাদরে আহ্বান করিলেন, সেই সমস্ত দ্রব্য তুলিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন ও বলিলেন, "অ হৃদু এ সেই চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনের মানুষ, সেই এদের সব দেখেছিলুম তোর মনে আছে? আর মা বলেছেন ওরা সব আবার আস্‌বে, এই একজন এসেছে। তা ইনি যে অন্ন এনেছে, বড় পবিত্র অন্ন। আলাদা করে রাখিস্ আর ঐতে থেকে রোজ ভোগ রাঁধতে দিস্। বেশ ভাল করে রাখিস্।" তদবধি বসুজ মহাশয় প্রায় প্রত্যহ প্রাতে যাইয়া রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতেন।

হৃদয়ের একদিন মনে হইল, মামা মাকালীর কাছে যখন যাহা চাহেন তাহাই প্রাপ্ত হন, মামার এত প্রতিভা, কিন্তু মূর্খ। মূর্খ নামটা বড় গালাগালি;—কালীদাস সরস্বতীর বরে কেমন বিদ্বান হইয়াছিল। মামা যদি বিদ্যার প্রার্থনা করেন ত নিশ্চয়ই বিদ্যালাভ করিতে পারেন। মনমধ্যে এইরকম তোলাপাড়া করিয়া একদিন একটু সুবিধা বুঝিয়া মাতুলের সেবা করিতে করিতে নানা কথার পরে কহিলেন; "মামা, তুমি মুক্‌খ হয়ে রইলে কেন, ওটা বড় গালাগালি। তুমি মার কাছে বিদ্যে চাও।"

রামকৃষ্ণ ভাবিলেন, ঠিক কথা মূর্খটা মহা গালাগালি। তাই এক দিন একাকী বসিয়া আছেন এমন সময় হৃদয়ের কথা তাঁহার স্মরণ হইলে তিনি জগন্মাতার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা তুই আমায় মুক্‌খু করলি কেন মা, তুই আমায় মুক্‌খু করলি কেন

মা।" বার কয়েক এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং তদবস্থায় দেখিলেন সম্মুখে পর্ব্বত সমান স্তুপাকার উচ্ছিষ্ট পাতা ও নানা প্রকার আবর্জ্জনা রহিয়াছে এবং মাকালী তাহা দেখাইয়া তাঁহাকে কহিতেছেন, "তুই বিষে চাস ; ঐ দেখ, ঐ বিষে ; নিবি ?" ইহা দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবের বমন উদ্যোগ হইল, তিনি মাতাকে কহিলেন "মা, আমার বিষে কাজ নেই।"

যোগেশ্বরী নাম্নী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতি কালে যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রভুদেবের দর্শন করিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা এই সময়ে এক দিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া কহিলেন, 'বাবা,তুমি যে বল স্ত্রালোক মহা সুন্দরী হলে জান্‌বে যে তার অংশে জন্ম ; তা বাবা একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছে, সে অপূর্ব্ব দেবীর সুন্দরী। তাকে তোমার কাছে আন্‌ব, দেখ্‌বে ?" রামকৃষ্ণদেব অনুমতি দিলেন, এবং হৃদয়কে কহিলেন, "ওরে হৃদে, যা দৌড়ে ফুল, বিল্বিপত্তর, চন্নন, আর ধূন আন।" হৃদয় দৌড়িয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ কন্যার আগমনের পূর্ব্বেই আহরণ করিয়া আনিলেন।

রমণীটী আগমন করিলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে করযোড়ে 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন। রমণী উপবিষ্টা হইলে হৃদয়কে তাঁহার চরণের নিকট ধূনা দিতে ইঙ্গিত করিলেন। ধূনা দিবামাত্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইয়া রমণী অল্প ঘোরের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তৎপরে পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা তাঁহার চরণ পূজা করিলেন। রামকৃষ্ণের হস্ত হইতে পুষ্প চন্দনাদি তাঁহার চরণে পড়িবামাত্র রমণী একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণদেব অমনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "মা আমায় বর দেও মা। বর

দেও যেন আমার মনোরথ পূর্ণ হয়।" তাঁহার আহূত ভক্তগণের আগমনই তাঁহার একমাত্র মনোরথ। ব্রমণ সমাধিভঙ্গের পর রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

এতদিন রামকৃষ্ণদেব যে বাহ্যশূন্য হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সন্তানগণকে আহ্বান করিতেছিলেন এই সময়ে তাহার ফল ফলিতে লাগিল। এই সময় হইতে বালব্রহ্মচারী, আজীবন ভগবদনুরাগী সর্ব্বত্যাগী বালক ভক্তগণ রামকৃষ্ণের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বর নিবাসী অষ্টাদশবর্ষীয় একটী ব্রাহ্মণ বালক কেশবের সংবাদ পত্রে রামকৃষ্ণদেবের বিষয় কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে প্রতিদিন বৈকালে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আগমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতিদিন আসিয়া ভাগীরথী তীরে বিচরণ করিয়া যান মাত্র, দর্শন লাভ হয় না। এই নৈরাশ্যে কিন্তু তাঁহার আগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। যুবা যদিও অষ্টাদশবর্ষীয় তথাপি দেখিলে চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। আজন্ম ঈশ্বরানুরাগী, ধীর ও গম্ভীর. ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই পূজা জপ ধ্যানেই বালকের মন নিবিষ্ট। এই বালব্রহ্মচারী দেখিতে মনোহর মূর্ত্তি, চক্ষু দুইটীতে পূর্ণ দেবভাব, এবং মুখখানি দেখিলেই মনে হয় যেন আনন্দের উৎস তাঁহার হৃদয়কন্দরে সদা বিরাজমান। প্রতিদিনই দেবালয়ে আগমন করেন কিন্তু অতি ধীর, এজন্য কে রামকৃষ্ণদেব, কেইবা তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে এবং তিনি কোন্ প্রকোষ্ঠেই বা আছেন জানিবার কোনও উপায় না পাইয়া ইতস্তত: ভ্রমণ করিয়াই চলিয়া যান। কিছু দিন এইরূপে অতীত হইলে পর একদিন একটী ঘরে অনেক জনতা দেখিয়া স্থির করিলেন যে রামকৃষ্ণদেব সেই স্থানেই আছেন। নিকটে

আসিয়া দ্বারদেশ হইতে রামকৃষ্ণ মুখরিত ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটস্থ একজনকে কহিলেন, "বাইরে যারা রয়েছে তাদের ডেকে এনে ভেতরে বসাও।" সে ব্যক্তি যাইয়া আর কাহাকেও না পাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণ কুমারকে আনিয়া ভিতরে বসাইলেন। পরে সকলে চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণদেব বালকের নিকট আগমন করিলেন এবং অতি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিয়া সহাস্যবদনে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক কহিলেন, "আমার নাম যোগীন্দ্রনাথ দেব শর্ম্মন্।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোমার বাবার নাম কি?"

যোগীন্দ্র কহিলেন, "শ্রীনবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী।"

রামকৃষ্ণদেব আবার হাসিয়া কহিলেন, "ওগো তোমার বাবা যে আমাদের খুব জানা লোক। তা বেশ।" এইরূপ তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলে পর বালক যখন বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আচ্ছা আবার আসবে ত?"

বালক কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ আসব।"

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "হ্যাঁ এসো।"

বলা বাহুল্য এই অপূর্ব্ব বালক পরে সন্ন্যাসী হইয়া যোগানন্দ নামে অভিহিত হন।

বসুজ মহাশয় বাগবাজারের একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁহার নিকটে রামকৃষ্ণদেবের বিষয় জানিতে পারিয়া তথাকার বহু লোক রামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অনেকেই তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আপনাদের ভবনে আনিয়া

কীর্ত্তন গান ও উৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যিনি যখনই ঐরূপ উৎসব করেন রামকৃষ্ণদেব তখনই তাঁহার নবাগত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়া দেন। এইরূপে তাঁহার নিকট যত লোক যান ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও একটী অভিনব নির্ম্মল আত্মীয়তার ভাব জন্মিতে লাগিল।

বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু এই সময় রামকৃষ্ণদেবকে মধ্যে মধ্যে নিজ আলয়ে আনয়ন এবং পল্লীস্থ ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আনন্দে উৎসব করেন। একদিন ঐরূপ উৎসবের সময় দুইটী আজন্ম ঈশ্বর অনুরাগী বালব্রহ্মচারী আসিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়ের নিবাস ঐ পল্লীতেই, তন্মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠের নাম হরিনাথ এবং অপরটীর নাম গঙ্গাধর অতঃপর ইঁহারাই তুরিয়ানন্দ ও অখণ্ডানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরীয় কথা কহিতে কহিতে কখন ভাবাবিষ্ট কখনও সমাধিস্থ হইতেছেন; পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য দীননাথের আলয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও সাধু দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রগাঢ় সমাধি ভঙ্গ হইয়া আসিতেছে; সন্ধ্যার সময় সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে এমন সময় তিনি অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় কহিলেন, "সন্ধে হয়েচে?"

রামকৃষ্ণদেবের সমাধি বা ভাবাবস্থায় তাঁহার চক্ষু একেবারে মুদ্রিত হইত না। ভাব, সমাধি প্রভৃতি যে কি অবস্থা তাহা কেবল যাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছেন তাঁহারাই জানিতেন।

তাঁহার সেই অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু তখন যে পার্থিব কিছুই দর্শন করিতেছে না, তাহা ঘোষজ মহাশয় কেমন করিয়া বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন,"সাম্‌নে আলো জল্‌ছে দেখতে পাচ্ছেন না—ভণ্ডামি দেখ?" অন্য কেহ হইলে হয়ত ভাবিতেন "এই ত হল প্রথম, আরও কি কতদূর ভণ্ডামি করে,দেখা যাক্।" ঘোষজ মহাশয় আপনাকে মানব চরিত্রের জহুরী বলিয়া বিবেচনা করেন সুতরাং মানব চরিত্রের তুলনায় রামকৃষ্ণদেবকে ভণ্ড ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে যদুনাথ মল্লিকের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে বাস করিতেন। ইনি রামকৃষ্ণদেবকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং প্রায়ই তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। এক দিন তিনি নানাবিধ নৈবেদ্য সাজাইয়া ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে করিতে গভীর ধ্যানমগ্না হইলেন। এদিকে রামকৃষ্ণদেব আপনার প্রকোষ্ঠ মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং তদবস্থায় যদুমল্লিকের উদ্যানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার নৈবেদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ধ্যান ভঙ্গ হইলে, রামকৃষ্ণদেব ইষ্টদেবতাকে নিবেদিত নৈবেদ্য আহার করিতেছেন দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, 'বাবা! আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। আজ তোমায় পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে বুঝ্‌তে পারলুম। বাবা তুমি আমায় কৃপা কর বাবা, আমার মানুষ জন্ম সার্থক হোক বাবা।" রামকৃষ্ণদেব বৃদ্ধার মস্তকে আপনার চরণ দিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার অনেকে জানিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু দক্ষিণেশ্বরে আছেন। ধনী নির্ধন

বালক বৃদ্ধ প্রভৃতি অসংখ্য লোক প্রতিদিন রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। এক দিন কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় কতকগুলি লোক তাঁহাকে দেখিবার মানসে যদুমল্লিকের উদ্যানে আগমন করিলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবকে তথায় আনিবার জন্য একজন লোককে রাসমণির দেবালয়ে পাঠাইলেন। রামকৃষ্ণদেব তথায় উপনীত হইলেন ও সকলকে নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলে, সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে অনুরোধ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বিবেক বৈরাগ্য ব্যতীত ভগবান্ লাভ হয় না ; ঈশ্বরই জগতের সার বস্তু আর সকলি অসার। কিন্তু বিষয় বুদ্ধি থাকৃতে তাঁকে পাওয়া যায় না। বিবেক বৈরাগ্য এলে, তবে মন পবিত্র হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, তবে না ভগবান্ কৃপা কর্‌বেন। কেমন জান, এক জন লোক তার ক্ষেতে জল ছেঁচ্‌ছে। সমস্ত দিন জল ছেঁচে সন্ধ্যার সময় মনে কর্‌লে, একবার দেখি কতটা জমি ভিজ্‌ল। এসে দেখে একটা আলের মধ্যে একটা গর্ত্ত দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেছে, এক ছটাক জমিও ভেজেনি। বিষয় বুদ্ধি থাকৃলে সেই রকম তাঁর নাম দিন রাত কর্‌লেও কিছুই হয় না।" মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "মশাই আমাদের মত বিষয়ী লোকে কি ভগবান্‌কে ঠিক ঠিক ডাকৃতে পারে। অমন যে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকেও মিথ্যে কথার জন্যে নরক দর্শন কর্‌তে হয়েছিল।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বটে, পরম ভক্ত যুধিষ্ঠির যিনি আজীবন সত্যবাদী ছেলেন, কত সদনুষ্ঠান, কত পরোপকার করেছেলেন, কত নিষ্ঠাবান্ ছেলেন, সমস্ত মহাভারতটা পড়ে, তাঁর এ সমস্ত গুণগুলি ছেড়ে শেষে ঐ একটা দোষই বুঝি ধোরে রেখেছ? তোমার বড় হীন বুদ্ধি? কোথায় সকল বস্তুর ভালটুকু নেবে, না যেখানে এক তিল

মন্দ আছে খুঁজে পেতে সেই মন্দটুকু ধরে রেখেছ। তা শুধু শাস্ত্র টাস্ত্র পড়্‌লে কিছু হয় না, সুবুদ্ধি চাই, বিবেক বৈরাগ্য চাই, নইলে সদসদ্ বিচার করা যায় না।”

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল এক দিন রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে যাইয়া কথা প্রসঙ্গে বলেন। “মশাই, ঐ এক ধর্ম্ম ধর্ম্ম আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করে দেশটা উৎসন্নে গেছে, মানুষ গুলো সব হীন হয়ে গেছে। সেই জন্যই ভারত ক্রমাগত স্বাধীনতা হারাচ্ছে, আর এখনো ইংরেজের লাথি খাচ্ছে। একমাত্র পারোপকার করাই ভাল কাজ, লোকের মঙ্গল করা, দেশের মূর্খ লোকদের লেখা পড়া শেখান, যাতে দেশের উন্নতি হয়, তাই করাই উচিত, আর তাই এক মাত্র ভাল কাজ। নইলে কেবল বৈরাগ্য আর ধর্ম্ম করে দেশের লোকগুলো হীন হয়ে গেছে, আর তাই এত দারিদ্র্য বেড়েছে। আপনার উচিত নব্য যুবক সম্প্রদায়কে সেই সব কাজ কর্‌তে শিক্ষা দেওয়া, তবে ত দেশের মঙ্গল করা হবে, নইলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কল্লে কিছুই হবে না।”

ভগবান্ রামকৃষ্ণ কহিলেন, “বাপু, তোমার একি র্‌াঁড়িপুতে বুদ্ধি? বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র যে বস্তুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার কর্‌ছে, তুমি সেই বস্তুকে এত হেয় আর দেশের সমস্ত অনর্থের মূল বল্‌ছ? ভেবেচ দু পাতা ইংরিজী পড়ে মহা জ্ঞানী হয়েছ, দুনিয়ার সব জেনে ফেলেছ, ধরাখানা একেবারে সরা দেখ্‌ছ, ভাব্‌ছ মনে কর্‌লেই দুনিয়ার হিত কর্‌বে? যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনি যেন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, কিসে জীবের হিত হয়, তিনি জানেন না, আর তুমি একেবারে সব জেনে ফেলেছ। বলি বাপু, বর্ষাকালে গঙ্গায় ছোট ছোট কাঁক্‌ড়া হয় দেখেছ? এ বিশ্বসংসারে তুমি তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব, একটা কীটাণুকীটও নও। তুমি আবার জীবের হিত কেমন করে কর্‌বে?

যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন, তিনি জীবের হিত করবেন, জীবের হিত করবার তোমার ক্ষমতা কোথা ?" এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইলেন, সকলেই নিস্তব্ধ, রামকৃষ্ণ পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "সেই একমাত্র ঈশ্বরই জীবের হিত করতে পারেন। জীব আগে তাঁকে জানুক, তাঁকে জেনে তাঁর অনুমতি পেলে, তিনি শক্তি দিলে, তবে মানুষের জগতের কল্যাণ করবার ক্ষমতা হয়। নইলে মানুষ নিজের হিত কিসে হয় তার জ্ঞান নেই ত পরের হিত কেমন করে করবে ? তুমি বড় জোর যেখানে দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষ সেখানে না হয় দুশটাকা চাঁদা পাঠালে ; যেখানে বড় জলকষ্ট সেখানে একটা পুকুর খুঁড়িয়ে দিলে। কিন্তু কত কোটি কোটি লোক যে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে তার তুমি কি করতে পার ? একবার অনাবৃষ্টি হলে একেবারে হাহাকার পড়ে যায়, পেটের জ্বালায় কত লোক মারা যায়, একবার মহামারী এলে অসংখ্য লোক মরে, তা বন্ধ করবার তোমার সাধ্য কোথায় ? ওসব মিছে অভিমান করতে নেই, যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনিই তার উপায় করেন ত হবে, নইলে তোমার মত ক্ষুদ্র জীবের কি সাধ্য যে জগতের হিতসাধন করে ? তবে জীবের ভগবান্ লাভ হলে, জীব শিব হলে, তার পর সে জীবের মঙ্গল করতে পারে। তাই, জীব আগে ঈশ্বর লাভ করুক, জ্ঞান লাভ করুক অভিমান শূন্য হোক্, তবে ত মা আনন্দময়ী বল দেবেন জীবের হিত করতে। আগে ভগবান্ লাভ করা চাই।"

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ, জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জের নিকট দেওভোগ গ্রামে, কলিকাতায় তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট প্রায় আগমন করিতেন। বন্ধুটীর নিবাস কলিকাতায় হাটখোলার নিকট। নাগ মহাশয় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অতিশয় সদাচারী ও সদ্ব্যক্তি,

বন্ধুটিও তদ্রূপ সৎলোক এবং পরস্পর প্রীতিও অত্যন্ত। এক দিন তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার পরামর্শ করিয়া একত্রে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে যত্ন সহকারে কাছে বসাইয়া তাঁহাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপরে ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। এই প্রথম পরিচয়েই বন্ধুদ্বয় তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইবার সময় নাগ মহাশয় রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইতে গেলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহার চরণদ্বয় সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "আবার এসো আস্‌বে ত ?" ইঁহারা দুই জনে পুনরায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব পদধূলি দিলেন না বলিয়া নাগ মহাশয় প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপনি সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে অনুপযুক্ত এবং আপনাকে দীনের দীন ও হীনের হীন মনে করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পক্ষে রামকৃষ্ণদেবের চরণ স্পর্শ করিতে গিয়া ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়া, আরও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিলেন, "আমি সে শ্রীপাদপদ্মের উপযুক্ত হলেই তিনি আপনি আমায় তাহা দিবেন।" এই অবধি তিনি যখনি তাঁহার নিকট যাইতেন দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন।

একদিন নাগ মহাশয় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একাকী আপন প্রকোষ্ঠে আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। নাগ মহাশয় প্রণাম করিয়া তথায় বসিলে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ঘরের দ্বার বন্ধ করিতে কহিলেন। নাগ মহাশয় দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইলে রামকৃষ্ণ উঠিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং ভাবে উন্মত্ত

প্রায় হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাষায় আপনাপনি কি বলিতে বলিতে ঘরের একবার এদিকে একবার ওদিকে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় সে ভাষা বুঝিতে না পারিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। অমনি রামকৃষ্ণদেব সে ভাব সম্বরণ করিয়া শান্ত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "পায়ে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে দে ত, বিষ ফোড়াটা বড় টাটিয়েছে।" নাগ মহাশয় দেখিলেন, তাঁহার পায়ে ফোড়াটী লাল হইয়া বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। নাগ মহাশয় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন ও প্রাণের সহিত পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবে বিভোর হইয়া আপন মস্তক দ্বারা সেই ঈপ্সিত পদ স্পর্শ করিলেন। কিন্তু অমনি রামকৃষ্ণদেব তাহা টানিয়া লইলেন এবং পূর্ব্ববৎ উন্মত্তভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। আবার ক্ষণিক পরে নাগ মহাশয়ের নিকট আসিয়া, "বড় টাটিয়েছে হাত বুলিয়ে দেরে," বলিয়া সম্মুখে শান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নাগ মহাশয়ও পুনরায় অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদে হস্ত বুলাইয়া পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া রামকৃষ্ণ পদযুগলে যেমন স্থাপন করিলেন, অমনি তিনিও উন্মত্ত হইয়া পা দুটী টানিয়া লইলেন এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ নাগ মহাশয়ের সহিত অপূর্ব্ব ব্যবহার করিয়া তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

মনমোহন মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি যাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট, তাঁহারা সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, পরমার্থ লাভের এমন সুযোগ আর নাই, এজন্য তাঁহারা আপনাপন আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিলেন, সকলকে লইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে একদিন রামকৃষ্ণদেব

মা কালীর নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—"মা সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কোয়ে আমার মুখ জ্বলে যাচ্ছে মা। তুই মা আমায় একটী ত্যাগী ছেলে দে মা। আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণ জুড়াই মা।" বারম্বার ঐ প্রার্থনা করিতে করিতে তিনি ভাবস্থ হইয়া দেখিলেন, মা আনন্দময়ী একটী বালকের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন মনমোহন মিত্র তাঁহার তৃতীয় ভগ্নিপতি রাখালকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব রাখালকে দেখিয়া চিনিলেন যে, ইঁনিই সেই মা কালী প্রদত্ত পুত্র। রাখালকে পাইয়া, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সহিত পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতে লাগিলেন এবং আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় লইলেন। আজন্ম ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত মগ্ন সুতরাং অন্য কোনও কর্ম্ম একান্ত অনিচ্ছার সহিত করিতেন, তাই রাখাল আজ এই প্রথম দর্শনেই রামকৃষ্ণদেবকে আপনার জন বলিয়া বুঝিলেন এবং দিবা নিশি তাঁহার সহবাসে থাকিয়া আনন্দে পরম স্বাধীনতা উপভোগ করিতে লাগিলেন। ইঁনিই পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, একদিন রামচন্দ্র তাঁহার মাসতুত ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে কহিলেন, "নরেন তুই ধর্ম্ম ধর্ম্ম কোরে ব্রাহ্মসমাজে হেথা সেথা ঘুরে বেড়ালে কি ধর্ম্ম হবে? ধর্ম্ম চাস্ ত দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে চল, যা চাস্ তা পাবি।" নরেন্দ্রনাথ জন্মাবধি তীব্র ঈশ্বরপিপাসু; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, প্রচারকগণের নিকট আপনার প্রাণের আবেগে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "ভগবান্ কি বলিতে পারেন? ভগবান্ দেখেছেন কি?"

আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারকেরা আপনাপন পুঁথিগত কথা মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরকে কেহই দর্শন করেন নাই। নরেন্দ্র ভাবিতেন, যে ভগবানকে কখনও দেখে নাই সে আবার ভগবানের কথা কহে কেন? সুতরাং ঐ সমস্ত প্রচারকের কথায় তাঁহার তৃপ্তি হইত না বরং তাহাদিগকে মহাভ্রান্ত বলিয়া বোধ করিতেন।

নরেন্দ্র এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছেন এবং এই বৎসর এফ্. এ পরীক্ষা দিবেন,—বয়ক্রম উনিশবর্ষ মাত্র. বহুবিধ ইংরাজি পুস্তক, গীতা, কয়েকখানি উপনিষদ্, বাইবেল ও কোরাণের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছেন। সাধারণতঃ 'সেকেণ্ড ইয়ারের' ছেলেরা যাহা শিক্ষা করে, তদপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত ও জ্ঞানী; গান গাহিতে অদ্বিতীয় পটু এবং প্রায় এক বৎসরের অধিক ওস্তাদদের নিকট রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করিতেছেন। কি প্রকারে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়, ইহা জানিবার জন্য সদাই তাঁহার মন উচাটন থাকিত এবং তজ্জন্যই তিনি নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সহিত আলাপ করিয়া বেড়াইতেন। সুতরাং ভক্তবর রামচন্দ্রের কথা মত নরেন্দ্রনাথ এক দিন তাঁহার সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া পশ্চিমদিকের চাতালে গেলেন। অপরিচিত হইয়াও তাঁহাকে পরিচিত ব্যক্তির মত ব্যবহার করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণদেব কহিতে লাগিলেন. "তুমি স্বয়ং নারায়ণ জীবের মঙ্গল কর্‌তে জন্মেছ, তা এখানে আস্‌তে এত বিলম্ব কর্‌লে কেন? সংসারী লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার ঠোঁট যে পুড়ে গেল,

তোমার জন্য যে আমি অস্থির হয়ে রয়েচি। এখন তোমার সঙ্গে কথা কয়ে জুড়াব।” নরেন্দ্র আরোও বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘রামদাদা আমাকে কার কাছে আনলে, ইঁনি ত উন্মাদ দেখছি!’ কিন্তু তাঁহার প্রাণের অভ্যন্তর হইতে সেই উন্মাদকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ হইতেছে, প্রাণ তাহার প্রতি একান্ত আকৃষ্টও হইয়া পড়িয়াছে। রামকৃষ্ণকে খ্যাপাও ভাবিলেন আবার তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্টও হইলেন! মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “এই লোক কি ঈশ্বর বিষয়ে মহা উপদেষ্টা?” যাহা হউক পুনরায় উভয়েই যখন গৃহমধ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?”

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, “হ্যাঁ।”

নরেন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?”

রামকৃষ্ণদেব অমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ, ঠিক যেমন তোমায় দেখ্‌ছি তেমনি তাঁকেও দেখি, তবে সে দেখা আরও ঘনীভূত। আর তুমিও দেখ্‌তে চাও ত, তাঁকে সেই রকম দেখ্‌তে পাবে।”

এতদিনের পর নরেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইলেন, এই কথা শুনিয়া যেন একটু সুস্থির হইলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে গান গাহিতে বলিলেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গানের মধ্যে কেবল দুই চারিটী ব্রহ্ম সঙ্গীত মাত্র জানিতেন, কারণ তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়কের নিকট রীতিমত হিন্দি গান শিক্ষা করিতেছিলেন। নরেন্দ্র গাহিলেন, ‘মন চল নিজ নিকেতনে’ ইত্যাদি। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার মধুর গান শুনিতে শুনিতে এক একবার সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ প্রাণ মন মিশাইয়া কাহাকেও গান গাহিতে শুনেন

নাই। গানটী শেষ হইলে পর, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি আর একটী গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র পুনরায় গান ধরিলেন, 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে, আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।" রামকৃষ্ণদেব আবার গভীর সমাধিস্থ হইলেন।

বিদায়কালে রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আবার এস, আস্‌বে ত ? তোমার জন্যে বড়ই উদ্বিগ্ন থাকি। আবার আস্‌বে ত ?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আজ্ঞে আস্‌তে চেষ্টা করব।"

বলা বাহুল্য ইঁনিই পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্বিখ্যাত হন। রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার কিছুদিন পরে জনৈক আত্মীয়ের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত খ্যাপা! অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ! অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বাড়ী আসিয়া রামদাদাকে সেই অদ্ভুত খ্যাপার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, রামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী, অমনি তাঁহার সেই আকর্ষণ শত সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। বুঝিলেন রামকৃষ্ণদেব নিশ্চয় অসামান্য লোক।

রাখালও সেই প্রথমবার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলেন এবং একদিন একাকী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। নরেন্দ্র নাথ তাঁহার আত্মীয়, পরস্পর প্রায়ই দেখাশুনা হয়। এইবার তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দুই জনেই সেই অপূর্ব্ব প্রেমিকের কথা কহিতে লাগিলেন, অবশেষে পরামর্শ করিয়া দুইজনে তাঁহাকে দর্শন করিতে পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। তাঁহারা এইরূপে কখন দুইজনে কখন বা একাকী রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতে

লাগিলেন এবং যতই অধিক তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রেমে অধিকতর আবদ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাখাল মাত্র ষোল বৎসরের বালক, আপনার প্রাণের টানে রামকৃষ্ণদেবের নিকট যখন তখন পিতার অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা চব্বিশ পরগণা বসিরহাট মহকুমার এক জন সঙ্গতিপন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি। রাখালের ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় দুই তিন দিবস একাক্রমে অবস্থিতি, তাঁহার পিতার অভিমত হইল না। অশেষ রূপে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিয়াও তিনি পুত্রকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইলে পর তাঁহাকে কখন একটী কুঠরিতে আবদ্ধ করিয়া কখন বা নজরবন্দি ভাবে রাখেন। কিন্তু এই সকল প্রতিবন্ধকে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার মন উঠিয়া না গিয়া বরং উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার অদর্শনে অতিশয় কাতর; কখন মা কালীর মন্দিরে তাঁহার জন্য ক্রন্দন করেন, আবার কখন বা প্রার্থনা করেন "মা, তুই রাখালকে এনে দে মা, তার জন্যে যে আমার প্রাণ যায় মা।" কিছু দিন এই রূপে অতীত হইলে পর রাখালের পিতা একটী বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, রাখালও সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে পলাইয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে ও ভাবে উন্মত্ত হইলেন। কখন তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া "গোপাল,গোপাল" বলিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন, ক্ষীর,ননী,খাওয়ান কখন বা গোপনে তাঁহাকে সাধন ভজন শিক্ষা দেন।

গুরুদেবের আজ্ঞামত রাখাল দুই চারি দিন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতে গিয়া স্পষ্টই দেখিতেন, সেখানে বাস করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সেখানে যেন তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, যেন চতুর্দিক

হইতে তাঁহাকে চাপিয়া ছোট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে, যেন তাঁহার সুবৃহৎ হৃদয় সেই স্বল্প আয়তনের স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না; তাহার উপর সেই অপার স্নেহময় রামকৃষ্ণদেবের অভাবে যেন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং একাক্রমে দুই তিন দিনের অধিক আর বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না।

সুপ্রসিদ্ধ বারাসাত নিবাসী পণ্ডিত প্রবর কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত নিত্যনিরঞ্জন সেন আহিরীটোলা নিবাসী ডাক্তার প্যারীচাঁদ মিত্রের ভুতুড়ে দলের একজন প্রধান মিডিয়ম, অর্থাৎ তাঁহারা যখনি কোন প্রেতাত্মাকে আহ্বান করেন, তখনি সেই প্রেতাত্মা নিত্যনিরঞ্জনের উপর আবির্ভূত হয়; এবং সেই অবস্থায় নিরঞ্জনের দ্বারা তাঁহার অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করান। নিরঞ্জনের বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশবর্ষ, দেখিতে অতি সুঠাম ও সুশ্রী, প্রকৃতি বীর-ভাবাপন্ন, অবয়বও তদ্রূপ সবল।

এক দিন নিরঞ্জন কোন লোকমুখে রামকৃষ্ণদেবের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম উপদেশের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট সমাগত লোকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমনের জন্য গাত্রোত্থান করিলে রামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষ যেন কাঁচের আলমারি।" গ্ল্যাসকেসের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকে, তাহা যেমন অনায়াসে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ তিনি মানুষ দেখিলেই তাহার হৃদয়ের বহুবিধ ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিতেন। সমাগত লোকদের প্রায় সকলেই কলিকাতাবাসী, এবং তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেরই এমন অবস্থা

নহে যে, প্রতিজনে নৌকা বা গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, অথচ পদব্রজে এতদূর গমন করা বড়ই কষ্টকর, ইহা জানিয়াই তিনি ব্যস্ত। যাঁহারা যাতায়াতের জন্য নৌকা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "হ্যাঁগা, এই ছেলে দুটী তোমাদের সঙ্গে নেও না? তোমাদের নৌকোয় এদের জায়গা হবে না কি?" রামকৃষ্ণদেব অনুরোধ করিতেছেন; সুতরাং নৌকায় স্থান না থাকিলেও, তাঁহারা, "আজ্ঞে, নিশ্চয় স্থান হবে," বলিয়া স্থান করিয়া লইতেন। আবার যিনি যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া দুই তিন জনকে তাঁহার সঙ্গে তুলিয়া দিতেন। এইরূপে সমস্ত লোকের যাহাতে গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনে কোনও প্রকার কষ্ট না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নিরঞ্জনের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার আদ্যোপান্ত পরিচয় লইলেন এবং এমন ভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন নিরঞ্জনের সহিত তাঁহার বহুকালের পরিচয়। বলিলেন, "দেখ্ নিরঞ্জন, 'ভূত ভূত' কর্‌লে ভূতই হয়ে যাবি, আর ভগবান্ ভগবান্ কর্‌লে ভগবান্‌ই হবি। তা কোন্‌টা হওয়া ভাল?" নিরঞ্জন বলিলেন, "তা হলে ভগবান্ হওয়াই ভাল।" এইরূপে নিরঞ্জনকে বুঝাইয়া 'ভূত নামান' কার্য্যের সকল প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন; নিরঞ্জনও তাহা ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অতঃপর রামকৃষ্ণদেব নিরঞ্জনের সহিত আলাপে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, আজ বাড়ী নাইবা গেলি, এই খানেই থাক্ না কেন?" নিরঞ্জন সম্মত হইলেন না। রামকৃষ্ণদেব বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন,

"ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে, যাস্‌নি, থেকে যা।" নিরঞ্জন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে বলিলেন, "তবে যাবি তো যা, আবার আসিস্‌, কবে আসবি?" নিরঞ্জন শীঘ্রই আসিবেন বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে নানা প্রকার অভিনব ভাবের উদয় হইতে লাগিল, ভাবিলেন, "থেকে গেলে হোত।" আবার ভাবিলেন, "না, মামা রাগ করবে।" মনে আর কোন চিন্তাই নাই, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রাণটী জুড়িয়া বসিয়া-রাছেন।

বাটী আসিয়া আবার কবে তাঁহার নিকট আসিবেন, ইহাই চিন্তা করেন। দুই তিন দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দ্বারদেশে দেখিবা-মাত্র দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, দিন যায় যেরে, তুই ভগবান্ লাভ করবি কবে? দিন যে যায়, ঈশ্বরকে না লাভ করলে সবই যে বৃথা হবে রে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল্। তুই তাঁর পাদপদ্মে কবে মন দিবি? ওরে, আমি তাই ভেবে যে অস্থির হয়েছি রে।"

বালক নিরঞ্জন অবাক্! ভাবিলেন, "একি! আমার ভগবান্ লাভ হচ্ছে না বলে ইনি এত কাতর কেন? কি আশ্চর্য্য! ইনি কে?" কিছু স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণের সমুদয় বাণী যেন অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন পরদিনও মহা আনন্দে কাটিয়া গেল। এইরূপে ক্রমে তিন দিবস চলিয়া গেল। অবশেষে চতুর্থ দিন মাতুলালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মাতুল উদ্বিগ্ন হইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার ভাগিনেয় কোথায় গিয়াছিলেন, কিছুই

তত্ত্ব পান নাই। নিরঞ্জন বাটী আসিবামাত্র তাঁহাকে নজরবন্দি রাখিবার জন্য দ্বারবানের উপর আজ্ঞা দিলেন, এবং কিছু দিন পরে তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়া দিলেন। এই বালকের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "ওরে নিরঞ্জন, তোর কোন অঞ্জন নেই।" এই জন্য তিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিরঞ্জনানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের আহূত বালব্রহ্মচারী ভক্তগণ—যাঁহারা তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে এক বিশেষত্ব ছিল। তাঁহারা অতি শৈশবাবস্থা হইতেই দিবানিশি প্রাণের ভিতর এক অনির্ব্বচনীয় অভাব বোধ করিতেন। পিতা মাতা হয়ত মহা ঐশ্বর্য্যশালী—ঐহিক সম্পদের এবং সুখরাশির হয়ত কোন অপ্রতুল নাই, তথাপি এমন সংসারে জন্মিয়াও রামকৃষ্ণদেবের এই সকল বালক ভক্তের জন্মাবধি এক মহা অভাব। এদিকে বালক বালকের মতই হয়ত অন্যান্য বালকদের সঙ্গে মহানন্দে ক্রীড়ায় মগ্ন, আবার পরক্ষণেই হয়ত মনের উচাটন ভাব আসিল; মনে ক্রমাগত উঠিতে লাগিল, "কৈ, আমার ত এখানে কেউ নেই, আমি ত এখানকার নই, এরা কে? এরা কি আমার খেলার সঙ্গী? না, না, কখনই না! তবে আমি কেন এখানে?" এইরূপ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া বালক হয়ত এক পার্শ্বে গিয়া উজ্জ্বল, প্রাণস্পন্দনপূর্ণ, গভীর নীল আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মাত্র তিন চারি বৎসরের বালক, তখন হইতেই তাহার মনে উদয়—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইহারা তাহার কেহই নয়! তাহার প্রাণে কি এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—কিছুতেই যেন তাহা মিটিতেছে না। দিন দিন যতই দেহের

পরিবর্দ্ধনের সহিত যৌবনের সঞ্চার হইতে লাগিল, ততই যেন সেই আকাঙ্ক্ষাও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমগ্র হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। দেবতার মনোলোভা কিন্নরকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত—তাহাতেও প্রাণ শান্ত হয় না। তাহাতে বরং সেই সর্ব্বগ্রাসী বিরাট অভাব যেন কোটিগুণে জাগিয়া উঠে। প্রাণ আর কিছুই চায় না। এই বিষম অভাব স্রোতে রামকৃষ্ণদেবের বালক ভক্তেরা সদা ভাসমান ছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিবামাত্র তাঁহাদের সেই অভাব-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়জগতে যেন কোটী সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তাই যোগীন, রাখাল, ও নরেন্দ্র ঘন ঘন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন আর প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন যে, রামকৃষ্ণের দেবসঙ্গই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র অভাব ছিল। এই সকল শুদ্ধ-সত্ত্ব বালব্রহ্মচারীদের সহিত রামকৃষ্ণদেব পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ ক্রীড়াও করিতেন, আবার কখন বা স্বয়ং যে সমস্ত সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও তৎসমুদয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণদেবের নিকট অবিরাম অসীম জনতা। যত দিন যাইতেছে, জনতাও ততই বাড়িতেছে। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্যস্রোতেরও বিরাম নাই। এক দিন তিনি বহুলোক পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিতেছেন, সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার কথা শুনিতে-ছেন, কেবল নরেন অন্যমনস্ক এবং অপর একব্যক্তির সহিত গল্পে মগ্ন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওরে শোন্ না, কথা শোন্ না।"

নরেন কহিলেন, "কথা কি শুনব, তোমার কথা শুনতে ত আসিনি।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কথা শুন্‌বিনি ত কেন আসিস্‌ ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "তোমায় ভালবাসি, তাই তোমায় দেখতে আসি।"

এই কথা শুনিবামাত্র তিনি উঠিয়া নরেনের হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, এবং দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ রাখিলেন। পরে সকলকে বুঝাইয়া কহিলেন, "এরি নাম অহৈতুক ভালবাসা। দেখ, আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না, তবু ভালবাসে। আর ভালবাসে বলে তাই দেখতে আসে। একেই বলে অকারণ ভালবাসা, ভগবানের ওপর এই রকম ভালবাসা চাই। কেন ভালবাসি তা জানিনি, ভালবাসি বলে ভালবাসি।" নরেন যেমন রামকৃষ্ণদেবকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তিনিও তদ্রূপ নরেনের অদর্শনে অস্থির হইয়া পড়িতেন, একাকী বসিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন, আবার কখন বা মা কালীর মন্দির মধ্যে যাইয়া মাকে বলিতেন, "তাকে এনে দে মা, তাকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। তুই মা তাকে এনে দে।" তিনি এইরূপ রোদন করিলেই তাঁহার সর্ব্বত্যাগী বালক ভক্ত তখনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

নরেন মূর্ত্তিপূজা মানেন না, সেজন্য তিনি রামকৃষ্ণদেবের সহিত প্রায় তর্ক বিতর্ক করেন। একদিন রামকৃষ্ণদেবের নিকট অনেক লোক বসিয়া আছেন, নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অনেক তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই আমার মাকে মানিস্‌ নি ত এখানে আসিস কেন ?"

নরেন্দ্র কহিলেন "তা আসব না কেন ? আসি বলে তোমার কালীকে মান্‌তে হবে ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আচ্ছা দেখিস্, এর পর আমার মাকে মানবি, আর মা মা করে চক্ষের জল মুছবি,—তবে তোর ঠিক হবে।" নরেন ইহার কোন উত্তর না দিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ প্রকোষ্ঠের বাহিরে চলিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব, যাঁহারা ঘরে ছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "দেখ, এই ছেলেটী সাকার মানেনা, আর আমায় বলে, 'তোমার ভাবটাবগুলো কিছু নয়, ও মাথার ব্যায়রাম।' কিন্তু বড় ভাল. শুদ্ধসত্ত্ব; এর পরে যখন দেখবে, তখন সব মানবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হলে কিছুই বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু খুব জ্ঞানী, আর অনেক পড়েছে। ও যখন প্রথম প্রথম আস্‌তো তখন একদিন ভাব হয়ে ওকে ছুঁয়ে দিয়েছিলুম, তাইতে ও একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হবার মত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল—"ওগো, তুমি আমায় কি করে দিলে? আমার যে বাপ মা আছে," তখন আবার ওর বুকে হাত দিয়ে বলি—"তবে এখন থাক্, তবে এখন থাক্।" ভগবান্ কি বস্তু দেখিবেন, প্রত্যক্ষ অনুভব করিবেন, ইহাই নরেনের আন্তরিক ভাব ছিল এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। সেই জন্য রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষে হস্ত দিয়া তাঁহার সমাধি অবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় হইতেই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার আহুত বালক ভক্তদিগকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরও তদবধি পরস্পরের মধ্যে এমন অসীম ভালবাসা জন্মিল যে, শোণিত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যেও তত ভালবাসা হয় না। দিনান্তে পরস্পরের সাক্ষাৎ না হইলে সে দিনটী যেন বৃথা যায়, আবার দেখা হইলেই রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা চলে। তাঁহার অপার ভালবাসা,

তাঁহার প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার কথা উথাপন করিয়া আনন্দ হইতে থাকে। একদিন জনৈক ভক্ত নরেনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উথাপন করাতে নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর হইল, পা হইতে রি রি করিয়া কি এক প্রকার স্নায়বীয় স্রোত উর্দ্ধ দিকে উঠিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুসমূহ শূন্যে বিলীন হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি বুঝি শূন্যে মিশাইয়া যাইবেন। পিতা মাতার জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহারা সন্তপ্ত হইবেন, এই ভাবনা মনে উদয় হওয়াতেই তিনি পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া ঐ ভাব প্রশমিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই অবধি তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু হইতে অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত সেই এক মহান্ লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, প্রত্যেক বস্তুই যেন তাঁহাকে সেই মহান্ অনাদি পুরুষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। তিনি সদা সর্ব্বদা এই ঐশীভাবের নেশায় সমাচ্ছন্ন রহিলেন। এই অপূর্ব্ব ভাব তাঁহার ন্যূনাধিক এক মাস কাল ছিল। তিনি এই ভাবে এতই বিভোর থাকিতেন যে, তাঁহার আত্মীয়গণ ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত তিনি কোন প্রকার বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন এবং শুনা যায় দিন কয়েক তাঁহার সেই ভাবের চিকিৎসাও করা হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের বাটীতে এই সময়ে একজন ছাপরানিবাসী ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া বাস করিতে থাকেন; ইঁহার নাম লাটু। আসিবার দুই চারিদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে তিনি শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে একজন পরমহংস সাধু বাস

করেন। শুনিয়া মহা উৎসাহে আহারাদির পর বেলা দশটার সময় পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বর কোন্ দিকে যাইতে হয় শুনিয়াছেন, কিন্তু কতদূর জানেন না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই, রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলিতেছেন। গ্রীষ্মকাল, পথশ্রান্তি ও আতপতাপে কাতর; মনে মনে বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছেন, "এরা কেমন লোক, কতদূর তা বলে দিলে না! আর কতদূর যেতে হবে?" ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে রাসমণির উদ্যানের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসিলেন, "এখানে কোন পরমহংস আছেন?" দ্বারবান বলিল, "আছেন ঐ উত্তর পশ্চিমের ঘরে থাকেন।" আরও অগ্রসর হইলে অল্প দূর হইতে লাটু দেখিলেন, লাল পেড়ে কাপড় পরা এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমের বারাণ্ডায় পাদচারণ করিতেছেন। দুই জনের চক্ষু মিলিল। লাটু ভাবিয়াছিলেন, গৈরিকধারী পরমহংস দেখিবেন, কিন্তু একথা আর তখন মনে উদয় হইল না; নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে আস্‌ছ?"

লাটু উত্তর করিলেন, "সিমলে রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী থেকে।"

রামকৃষ্ণদেব অতি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, এবং পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে দিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লাটু যাঁহার সহিত আলাপ করিতেছেন, তিনি কে, তিনিই পরমহংস কি না, এসকল কোন প্রশ্নই তাঁহার মনে উদয় হইল না, কেবল তাঁহার নিকট বসিয়া বাক্যালাপেই মহাতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়া উঠিলেন,—আহা, রাম আমায় বড় ভালবাসে। কেবল এই কথা শুনিয়া লাটু একবার ভাবিলেন, তবে ইনিই সেই

সাধু হইবেন। কিন্তু ইনি সেই সাধু হউন আর নাই হউন, তাঁহাকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং ইনি পরমহংস না হইলেও লাটুর আর পরমহংস অনুসন্ধানের ইচ্ছা হইল না।

বৈকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য লাটু উঠিয়া দাঁড়াইলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, আর হেঁটে যেয়ো না, পয়সা দিচ্ছি, গাড়ী কি নৌক কোরে যাও।"

লাটু বলিলেন, "পয়সা কাজ নেই, আমার কাছে পয়সা আছে।"

রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ আছে ত? না থাকে, লজ্জা কোরোনা।"

লাটু হাসিতে হাসিতে জামার জেবে পয়সা বাজাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন, হামার কাছে পয়সা আছে;" এবং রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার এস।"

লাটু বলিলেন, "হ্যাঁ আসব।"

রামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ এসো।"

সেদিন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রামচন্দ্রের সহিত লাটুর কেবল পরমহংসদেবের কথাই হইয়াছিল। দুই তিন দিবস পরে একদিন লাটু প্রাতভোজন না করিয়াই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। রামকৃষ্ণদেব ভোজনে বসিতেছিলেন, লাটুকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিলেন, বলিলেন, "কি গো, এসেছ, বেশ হয়েছে; আহার কোরে আসনি ত?" যেন রামকৃষ্ণদেব তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

লাটু উত্তর করিলেন, "না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে বেশ হয়েছে, এখন প্রসাদ পাও।"

লাটু বাঙ্গালীর হাতের রান্না খান না। রামচন্দ্রের বাটীতে থাকেন বটে কিন্তু তাঁহার অন্ন ভোজন করেন না, স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন। এখানে সমস্ত অন্নব্যঞ্জনই বাঙ্গালীস্পৃষ্ট, কেমন করিয়া ভোজন করিবেন? সুতরাং তিনি এখানে আহার করিবেন না স্থির করিলেন। রামকৃষ্ণদেব 'এখানে প্রসাদ পাও' বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপনি আর একখানি কলাপাতা আনিয়া আপনার সম্মুখে পাতিলেন, তাহা গঙ্গাজলে ধৌত করিলেন, পানের জন্য একটী ঘটিতে গঙ্গাজল দিলেন। লাটু এই সমস্ত উদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন, "আপনি কেন এত কষ্ট কচ্ছেন? হামি খাব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেন খাবে না? গঙ্গাজলে রান্না, তার ওপর আবার মায়ের প্রসাদ। কেন খাবে না? খাবে বই কি। বোস, খাও। প্রসাদ খেতে কোন দোষ নেই, বোস খাও।"

লাটু বলিলেন, "না মশাই, হামি খাব না। আপনি আহার করুন"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা কি হয়? কেন খাবে না? প্রসাদ খেতে দোষ কি?"

লাটু হঠাৎ বলিলেন, "তবে আপনার প্রসাদ যদি হয় ত খাব।"

লাটুর মনে পূর্ব্বাপর কোন চিন্তার উদয় না হইয়া তাঁহার জিহ্বা যেন আপনা আপনি এই কথা বলিয়া ফেলিল, কিন্তু লাটু তার জন্য ক্ষুব্ধ নহেন। বরং মুখ হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইলে পর অস্ফুটভাবে মনে উদয় হইল যে, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদ হইলে তাহাতে আর বাঙ্গালীস্পর্শ জনিত দোষ থাকিবে না। লাটু আহার করিতে সম্মত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তখনি আপনার অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লাটুর পাতায় তুলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে আহার করিতে

বলিলেন। লাটু ভোজনে বসিলে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "খুব পেট ভোরে খা। পায়েস বেশি করে দি।" এই বলিয়া একটী বাটি ভরিয়া পায়সান্ন, এবং লুচি ও মিষ্টান্ন দিলেন লাটুকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। লাটুর পিতা মাতা ভাই ভগ্নী কেহই নাই, সুতরাং ক্রমশঃ রামকৃষ্ণদেবই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণদেব প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার একজন আহূত ভক্ত।

কিছুদিন পরে রামচন্দ্রের সহিত লাটু একদিন তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ রাম, ঐ ছেলেটী বড়ই শুদ্ধসত্ব ওকে আমার কাছে রেখে দেও।"

রামচন্দ্র কহিলেন, "লাটু কিছু আমার বস্ত নয়, আপনি ওকে বলুন, ওর ইচ্ছা হলেই হবে। আর আপনার কাছে থাকা, এ ত অতি সৌভাগ্যের কথা।" লাটু তদবধি পরমহংসদেবের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইনিই পরে সন্ন্যাস লইয়া অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রাখাল তাঁহার পিতার সাংসারিক গোলযোগের সময় হইতে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহার অন্বেষণে তথায় আগমন করিয়া দেখিলেন, পরমহংসদেবের নিকট সমাজের অতি মহাশয় ব্যক্তিরা আসিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রিয় পুত্রকে পরমহংসদেব অতিশয় ভালবাসেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকেই আইনজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তাঁহাকেও প্রায় সর্ব্বদাই মামলা মোকদ্দমা করিতে হয়। তাঁহাদের সহিত তাঁহার আইনসংক্রান্ত পরামর্শের বিশেষ সুবিধা হওয়াতে তথায় মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি

বিপন্মুক্ত হইয়া ভাবিলেন, হয়ত তাঁহার ভক্তপুত্রের সাধুসহবাস এবং সাধুসেবার গুণেই এই মহাবিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পুত্রের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতির পক্ষে আর কোনও আপত্তি তুলিলেন না। রামকৃষ্ণদেবও তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া একদিন সুযোগমত কহিলেন, "হ্যাঁগা, এখানে আসলে রাখালকে কিছু বলো না, আমি ওকে বড় ভালবাসি; আর রাখালও এখানে থাক্‌তে বড় ভাল বাসে।"

রাখালের পিতা যেন কৃতার্থ বোধ করিলেন, কহিলেন, "সে কি মশাই, রাখাল ত আপনারি ছেলে, তা আপনার কাছে এসে থাক্‌বে, এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার কোন আপত্তি নেই, এখানে থাকুক না; তবে এক আধবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন।" রাখালের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি পরমানন্দে রামকৃষ্ণদেবের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বলিয়া বুঝাইয়া পিত্রালয়ে পাঠান কিন্তু তিনি পিত্রালয়ে দুই এক দিনের অধিক থাকিতে পারেন না।

রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন প্রতিবৎসর তথায় একটী উৎসব হইত। এই সময়ে সেই উৎসবের দিন পড়িয়াছে এবং রাসমণির দৌহিত্র ও অন্যান্য পরিবারবর্গ উৎসব উপলক্ষে দেবালয়ে আগমন করিয়াছেন। পরমহংসদেবের ভাগিনেয় হৃদয়ানন্দ শ্যামা পূজা করিতেছেন। মথুরের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের এক অষ্টম বা নবমবর্ষীয়া কন্যা শ্যামা পূজা দর্শন করিতে মন্দিরমধ্যে এই সময় উপস্থিত হইল। কন্যাটী রূপে যেন সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। পূজার সময় মন্দির মধ্যে তাহার অকস্মাৎ আগমনে হৃদয়ের মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। বালিকার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হৃদয়ের কুমারী-পূজা করিবার

প্রবল বাসনা জন্মিল, অমনি তাহার পদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পূজান্তে বালিকা অন্দরে গমন করিলে তাহার মাতা তাহার পদে চন্দনচিহ্নের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বালিকা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিল। পূজারী ঠাকুর শূদ্রকন্যার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন! মহা অকল্যাণের কথা! কি সর্ব্বনাশ! বালিকার মাতা শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথ কন্যার বিপদাশঙ্কায় ক্রোধান্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়কে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য দ্বারবানের উপর আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রাণীর পদ পূজিত হইলে যদি শূদ্রাণীর কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা হয়, ক্রোধান্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের অবমাননা এবং দ্বারবান দ্বারা তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহাতে কোন অপরাধ হইতে পারে কিনা, এ বিবেচনার আর তাঁহার সময় হইল না। হৃদয় এই রূপে ঘোরতর অবমানিত হইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইয়া সমস্ত কহিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুই বা কেন অমন করলি? এখন কি করবি?"

হৃদয় কহিলেন, "কেন মামা, তার ভাবনা কি? যেখানে দু চোক্ যায়, সেখানে যাব। আর তুমিও চল, তোমারও আর এখানে থাকা উচিত নয়। আর মান থাকবে না, তোমায় আবার কবে অপমান করবে। তুমিও চল মামা।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আমি কোথায় যাব? আমি যাব না।"

হৃদয় ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দ্বারবান্ আসিয়া রামকৃষ্ণদেবকে জানাইল যে, তাঁহারও স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব দ্বিরুক্তি না করিয়া আসন পরিত্যাগ করিয়া একবস্ত্রেই উদ্যানের দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধপথে ত্রৈলোক্য তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট দ্রুত আগমন করিলেন, এবং করযোড়ে কহিলেন "মশাই! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "যেতে বল্লে তাই যাচ্ছি।"

অতি কাতর ভাবে বিনয় করিয়া ত্রৈলোক্য তাঁহাকে ফিরাইলেন, কহিলেন, "কন্যাটীর অমঙ্গল না হয়, আপনি বলুন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মার ইচ্ছে, অমঙ্গল হবে না।"

এখন হইতে তাঁহার আহুত ভক্তগণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন এবং আপাততঃ লাটু, যিনি পরে অদ্ভুতানন্দ নামে অভিহিত হন, এবং হরিশ তাঁহার নিকট রহিলেন। তাঁহার অন্যান্য আহূত নবীন ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই চারি দিন তথায় অবস্থিতি করেন। রামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন—ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী। ঈশ্বরকোটী নিত্যমুক্ত—যখন ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, তাঁহার লীলার সহায়তার জন্য তাঁহারা সঙ্গে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের আর একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও দেহ রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানবের নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের পর একুশ দিনের অধিক দেহ থাকে না।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহার চিরকুমার সাঙ্গোপাঙ্গদের জীবনে এই কিশোর বয়স হইতেই আপনার ভাবরাশি বপন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, অগ্রে ঈশ্বর লাভ, তৎপরে অন্য কার্য্য। আহার সম্বন্ধে তাঁহার এই উপদেশ ছিল যে, "দিনের বেলা বারুদ ঠাশা করে খেতে হয়, আর রাত্রে এক কোণ খালি রেখে খেতে হয়।" যাঁহারা এইরূপে রাত্রে তাঁহার নিকট থাকেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে সাধন

শিক্ষা দেন। রাত্রে পূর্ব্বোক্তমত অল্পস্বল্প আহার করাইয়া নিজ গৃহে শয়ন করাইয়া কিছুক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হয়ত কহিলেন, "আর বকিস্ নি, এখন একটু ঘুমো।" আপনিও শয়ন করিলেন, একজনকে কহিলেন "ওরে,মশারিটা ফেলে দে।" সে বালক তাঁহার মশারি ফেলিয়া যেমন গুঁজিয়া দিতে গেল অমনি রামকৃষ্ণদেব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, কি করিস্ রে, প্রাণ যায় যে রে। অমন করে মশারি গুঁজিসনি, হাঁপিয়ে মরি।" রামকৃষ্ণ সমাধিবুথানে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, আমাকে ভাবমুখে রাখিস মা।" তাই তিনি অনন্ত ভাবের প্রস্রবণ, আর যেমন যেমন ভাব উদয় হইত, তেমনি তেমনি ক্রিয়াও তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত। তাই তাঁহার জীবনে গভীর অদ্বৈতবোধ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রতি কার্য্যে সহজসিদ্ধ হইলেও মধুময় ভক্তি ও ভাবুকতার আবরণে উহা সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকিত। তাই তাঁহার সমক্ষে ভাবের বিরোধি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার শারীরিক যন্ত্রণা হইত। তাঁহার সমক্ষে কেহ কাপড়ের থান ছিঁড়িলে তাঁহার বোধ হইত, যেন তাঁহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করা হইতেছে। মশারি ফেলিয়া তাহা শয্যার নীচে আবদ্ধ করিলে তাই তাঁহার প্রাণে অবিরাম মুক্তভাবের প্রবাহ, যাহাতে সমগ্র জগতের সহিত তাঁহার একত্বজ্ঞান বিজড়িত থাকিত, তাহা যেন সহসা বদ্ধ হইয়া যাইত, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইত। রামকৃষ্ণদেবের কথায় বালক অবাক্ হইয়া মশারিটি না গুঁজিয়াই শয়ন করিল, আর তাঁহারও হৃদয়ে আপনাপনি মুক্তভাবের ফোয়ারা চলিতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব করতালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে লাগিলেন। কতক্ষণ তিনি ঐরূপ করিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে বালকগণের কিঞ্চিৎ মাত্র তন্দ্রা আসিয়াছে,

এমন সময় রামকৃষ্ণদেবের কোমল করস্পৃষ্ট হইয়া একজন জাগ্রত হইয়া বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে চুপি চুপি কহিলেন, "দেখ্ তিন জন জাগে—যোগী, রোগী, আর ভোগী। ঘুমুবি কিরে! যা, অমুক জায়গায় বসে ধ্যান করগে যা। তার পর কেমন ধ্যান করলি এসে বলিস।" এই বলিয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া ও কি ধ্যান করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। বালক নিশীথের আঁধারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পদ্মাসনে গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। রামকৃষ্ণদেব আর এক-জনের নিকট যাইয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত দিয়া কহিলেন, "ওরে ঘুমুলি নাকি রে? ওঠ্ ওঠ্, এই দিকে আয়," বলিয়া তাঁহাকে কিয়দ্দূরে লইয়া গেলেন। এইরূপ সকলকে একে একে জাগ্রত করিয়া নিজ নিজ অধিকার মত ধ্যানের উপদেশ দিলেন। নিশাবশানের দুই চারি দণ্ড পূর্ব্বে বালকেরা ধ্যানান্তে একে একে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব গভীর সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গের সময় কহিতে লাগিলেন, "তামুক খাব, তামুক খাব।" এইরূপ এক একটী সামান্য বাসনা অবলম্বন করিয়া, তিনি আপনার ব্রহ্ম-সমাহিত চিত্তকে স্থূলজগতে আনয়ন করিতেন। পরে এক এক-জনকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কাহার ধ্যানে কি প্রকার দর্শনাদি হইল, আপনি বলিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন রে, এই রকম দেখলি, না?" বালকেরা সবিস্ময়ে কহিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' রামকৃষ্ণ-দেব কহিলেন, "বেশ, বেশ, তোর খুব শিগ্‌গির হবে।" তাহার পর আবার তাঁহাদিগকে শয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি পূর্ব্ববৎ করতালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল, হরি ওঁ হরি ওঁ' বলিতে বলিতে শয্যায় শয়ন করিলেন। আবার বালকদের একটু একটু করিয়া

তন্দ্রা আসিতেছে, কিন্তু সকলেই যেন ধ্যানেই আছেন, এইরূপ বোধ করিতেছেন। যেন তাঁহারা দেবলীলায় দেবদেবীর সঙ্গে নানাবিধ অপূর্ব্ব লীলায় মগ্ন। হঠাৎ সে তন্দ্রা ভাঙ্গিল, সকলে দেখিলেন ঊষার ঈষদুজ্জল ছটায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দিগম্বর রামকৃষ্ণ মধুর গান করিয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে ঘরের মধ্যদেশে আসিলেন, অমনি বালকেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে যাইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলেন।

রামকৃষ্ণদেব আজন্ম জানেন, ধর্ম্ম আদান প্রদানের বস্তু, সমগ্র জগৎকে ধর্ম্মদানের ব্রত লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ, সেই মহাকার্য্যের সহায়তার জন্যই তাঁহার বালব্রহ্মচারীদের ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন, এবং সেই মহাকার্য্যের ভার দিবার জন্যই সেই যুবা শিষ্যগণকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কঠোর সাধনা করাইতেছেন। দ্বাদশবর্ষ নিজের সাধনার সময় চেষ্টা করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, এবং গাহিতেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
(এখন) যোগনিদ্রা তোরে পেয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

তাই বোধ হয়, তিনি কার্য্যেও করিতেন।

ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয়ের উপর নেপালরাজের কাষ্ঠ ব্যবসায়ের ভার। বিগত কয়েক বর্ষ ঐ কারবারে কোনও লাভ হয় নাই। ব্যবসাটী যে বিশেষ ক্ষতিজনক, তাহা নহে, কিন্তু কোন প্রকার অসাবধানতা বশতঃ প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় রাত্রে অনেকগুলি কাঠ ভাগীরথীর স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইত সুতরাং ব্যবসায়ে লোকসান আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয় ভাবিলেন, কিছুকাল পরে প্রকৃত লাভের অংশ লোকসনে ভুক্তান হইয়া যাইতে পারে,

সেই আশায় কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজসরকারে কোন প্রকার হিসাব নিকাশ দেন নাই। এদিকে নেপালের দরবারে কয় বৎসর কলিকাতার কাঠের কারবারের কোনও হিসাবপত্র না যাওয়াতে চতুর রাজমন্ত্রীর মনে বিশ্বনাথের উপর সন্দেহ জন্মিল এবং তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গুপ্তচরেরা নানা প্রকার সংবাদ আনিলে পর তিনি বিশ্বনাথকে হিসাব দিবার জন্য কাঠমাড়ুতে আহ্বান করিলেন।

লাভের কড়ি লোকসানে ভুক্তান হইবার পূর্ব্বেই মন্ত্রী দরবারে হিসাব দাখিল করিবার আজ্ঞা পাইয়া ভক্ত বিশ্বনাথ অকুল পাথারে পড়িলেন, সন্ধান পাইলেন, মন্দলোক দ্বারা মন্ত্রীসকাশে তাঁহার দুর্ণাম রটিত হইয়াছে। মন্দলোক মিথ্যা প্রমাণ যোগাড় করিয়া রাজমন্ত্রীর নিকট যদি তাঁহাকে চোর সাব্যস্ত করে, তাহা হইলে মন্ত্রীর ক্রোধে পড়িয়া যে তাঁহার কি পরিমাণ হইবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বীরহৃদয় বিশ্বনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, প্রকৃত হিসাব দাখিল করিয়া যাহা সত্য কথা তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবেন যে, অসাবধানতা বশতঃ অনেক কাষ্ঠ ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাতে ফল যাহাই হউক, তিনি কখনই সত্যভ্রষ্ট হইবেন না, ইহাই স্থির করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নেপাল যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে একবার তাঁহার রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার জন্য বিশ্বনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কাপ্তেন, আজ তোমায় এত বিষণ্ন দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে? এ কদিন আসনি কেন?"

কাপ্তেন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কহিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তবে এখন কি কর্‌বে?"

কাপ্তেন কহিলেন,"গুরুজী, একটা দোষ হয়েছে বলে মিথ্যা কিছু বলতে পারব না। সমস্ত সত্যি কথা বলব, ঠিক হিসাব দেব, তারপর মন্ত্রী মহারাজ যা সঙ্গত হয়, তাই করবেন। কিন্তু মন্দলোকে যদি মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে চোর প্রমাণ করে, তাহলেই মন্ত্রীমহারাজ সর্ব্বনাশ করবেন। এই ভাবনায় আমার প্রাণ আকুল হয়েছে, গুরুজী ; তাই আপনার শরণাপন্ন হতে এসেছি।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ভয় কি, তুমি চুরি করনি, তোমায় কে কি করবে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি সত্যপথে আছ, মা নিশ্চয় তোমায় রক্ষা করবেন। ঘটনা যা হয়েছে, মন্ত্রীকে বোল, সত্যি কথা শুনলে মন্ত্রীর দয়া হবে। কাপ্তেন, তুমি ভেবো না ; কোন ভয় করো না ; মা তোমার মঙ্গল করবেন।"

রামকৃষ্ণদেবের আশ্বাসবাণী শুনিয়া বিশ্বনাথ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে নেপাল যাত্রা করিলেন। কাঠমাড়ুতে উপস্থিত হইয়া দুর্দ্দান্ত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাতে বিশ্বনাথ নির্ভীক অন্তরে প্রকৃত ঘটনা সমুদয় বিবৃত করিয়া হিসাব দাখিল করিলেন। মন্ত্রীমহারাজের চিত্তাকাশে মিথ্যা সংবাদে যে কুজ্ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছিল, কাপ্তেনের সরল সত্য কথার প্রভাবে তাহা বিদুরিত হইল, মন্ত্রী পরম সন্তোষের সহিত তাঁহাকে কর্ণেল উপাধিযুক্ত এবং রাজপ্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। বিশ্বনাথ এইরূপে জয়লাভ করিয়া কলিকাতায় পঁহুছিবামাত্র মহা আনন্দে রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসিলেন।

রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কি গো, কাপ্তেন যে! সব মঙ্গল ত?"

কাপ্তেন রামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক হাসিতে

হাসিতে কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সব মঙ্গল, আর কাপ্তেন নেই, কর্ণেল হয়েছি।"

রামকৃষ্ণদেব উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সে আবার কি?" বিশ্বনাথের নিকট সমস্ত সংবাদ শুনিয়া কহিলেন, "তা বেশ হয়েছে, আমি কিন্তু তোমায় সেই কাপ্তেন বলেই ডাকব।" তাহার পর নানা কথাবর্ত্তার পর বিশ্বনাথ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

দিবসে আহারাদির পর রামকৃষ্ণদেব এক একদিন রাখালকে বলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজনা; পান সাজা নেই যে।" রাখাল স্পষ্ট উত্তর করিলেন, "পান সাজতে জানিনি।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, 'সে কি রে, পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? পান সাজাও কি আবার শিখতে হয়? যা, পান সেজে আন্।' রাখাল উত্তর করিলেন, 'পারব না।' রাখালের চোটপাট্ উত্তর শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া উঠিলেন, আবার বলিলেন, "সে কি রে, পারবিনি কি? এমন কথাও ত শুনিনি, পান সাজা—তাও জানিনি পারিনি। যা, একটা পান সেজে নিয়ে আয়।" রাখালের ভাব যেন রাজপুত্র, পিতা রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার খেলাধূলা ও আনন্দ করিবারই সম্পর্ক, আদরে কখন কাঁধে চড়েন, কখন কোলে বসেন, কত রকম খেলা করেন, সুতরাং রামকৃষ্ণদেব পান সাজিতে জিদ করাতে বালক একটু বিরক্তভাবে কহিলেন, "পারব না মশাই।" রামকৃষ্ণদেব আরও হাসিতে লাগিলেন। এইরূপে কাজ করিতে বলিয়া রাখালকে বিরক্ত করিয়া মহা আনন্দ করিতেন, কিন্তু অন্য কেহ তাঁহার রাখালকে কোন প্রকার কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিলে তাহাকে বলিতেন, "ওরে, ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিসনি। ওকে কোন কাজ করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়, আর ওর প্রকৃতি

বড় কোমল, ও কি কোন কাজ করতে পারে?" আবার লাটুকে তিনি যখন যাহা করিতে বলেন, লাটু তাহাতেই রাজী, দ্বিরুক্তি নাই। একদিন কাহাকেও বলিলেন, "দেখ, একখানি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এন ত, নেটাকে পড়াব, একেবারে আমার মত মূর্খ থাকবে, একটু একটু পড়ুক, কেমন?" তিনি বলিয়াছেন—পড়াশুনা করা উচিত, সুতরাং পুস্তক আনীত হইলে আহারান্তে বিশ্রামের পর লাটু পুস্তক লইয়া রামকৃষ্ণের নিকট পড়িতে বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব বই খুলিয়া প্রত্যেক অক্ষরের নীচে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বল্, ক।" লাটু বলিলেন, 'কা। খ—খা, গ—গা। রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন, "ওরে কা খা, গা, নয়, ক, খ, গ, ঘ, ঙ বল।" লাটু বলিলেন, 'কা খা গা ঘা ঙা।' রামকৃষ্ণদেব ও অন্যান্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। লাটুও হাসিতে লাগিলেন। হাসির ঘটায় আর পড়ান হইল না। দুই তিন দিন এই প্রকার চেষ্টা করিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "না রে তোর হবে না।' কিন্তু তার পর তাঁহার কাছে যিনিই আসিতেন, লাটুর পড়ার নকল করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন আর মহা হাসি পড়িয়া যাইত।

রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকে নিজেদের বাটী লইয়া যাইতেন। তথায় সকলে মিলিয়া সংকীর্ত্তন করেন এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট ঈশ্বরীয় কথা শুনেন। প্রায় প্রতি শনিবারেই কোন না কোন ভক্ত এই প্রকার একটি উৎসব করেন। রামচন্দ্রেরও ইচ্ছা, ঐ প্রকার উৎসব নিজ গৃহে করেন। একদিন রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, "মশাই, আমাদের ওখানে এক দিন পায়ের ধুলা দেবেন?" রামকৃষ্ণদেব সম্মত হইলেন। রামচন্দ্র দরিদ্রসন্তান, তাহার মাসতুতো ভাই নরেন্দ্রনাথদের বাটিতে থাকিয়া অতি কষ্টে

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ক্যাম্বেল কলেজে পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছেন। তার পর মেডিকেল কলেজে রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্য বেতন পাইতেছেন। কিন্তু এই চাকরিটী পাইয়া অবধি সেই বেতন হইতেই কিছু কিছু অর্থ জমাইতে আরম্ভ করেন, এবং রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে মনে মনে ভগবানের কাছে মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই তাঁহার বেতন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয় এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্থ আপন স্ত্রীর নিকট লুকাইয়া রাখিতেন। প্রকৃতপক্ষে অর্থে তাঁহার বিলক্ষণ মায়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা না করিতে পারিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মহা যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। কিছুদিন পরে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "ওহে, একদিন তোমাদের বাড়ী যাব বলেছিলুম যে, তা কবে যেতে হবে?" রামকৃষ্ণদেব যেখানে যান, তাঁহার সহিত অন্ততঃ দেড় শত কখন বা ততোধিক ভক্ত গমন করেন। এই সমস্ত লোকদের পরিতোষপূর্ব্বক আহার এবং উৎসবের জন্য কীর্ত্তনাদিতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। অর্থ ব্যয় করিয়া ভক্তসেবা করা বিপদের কথা। রাম অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন, কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া একটি দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেই দিন রামের বাড়ী রামকৃষ্ণদেব ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া উৎসব করিয়া আসিলেন।

একদিন রামের সহিত পরম ভক্ত নেপালের কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহিত রামকৃষ্ণদেব পরিচয় করিয়া দিলেন। বিশ্বনাথের পরিচয় দিবার সময় রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'দেখ, কাপ্তেন বীরের

ব্যাটা বীর, ওর বাপ এক হাতে তলোয়ার নিয়ে আর এক হাতে শিবের পূজ করত। যুদ্ধের আগে শিবপূজ করে বেরুত। এরা,পরমভক্তের বংশ কাপ্তেনও তেমনি সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক। এরও খুব বীরভাব আছে।"

রামচন্দ্র বিশ্বনাথের সহিত উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এক দিন সেখানে কে কতদিন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন, কি প্রকারেই বা প্রথম তাঁহার বিষয় জানিতে পারিলেন, পরস্পরে ইত্যাকার নানাবিধ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা উপাধ্যায় মশাই, আপনি এঁকে কি রকম মনে করেন?"

উপাধ্যায় কহিলেন, "আমি বেদ বেদান্ত সব পড়িছি, নানা দেশে নানা রকম সাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, কিন্তু এঁর কাছে এসে আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। বেশী আপনাকে আর কি বলব? বেদে যা নেই, ইনি তা দেন, এঁর কাছে তা পাওয়া যায়, আর ইনি সেই বেদ বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের প্রামাণ্যের জন্য এসেছেন—আমি ত এই প্রত্যক্ষ করছি। আপনিও আসা যাওয়া করুন, সমস্তই প্রত্যক্ষ করবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণ খুলিয়া গেল, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার আগমনের প্রকৃত কারণ, তাঁহার সেই অদ্ভূত স্বপ্ন, এক জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন, তার পর তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমন, দুই জনে ভূতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন প্রভৃতি সমস্ত কথা রামকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বনাথের অচলা ভক্তি, স্থির বিশ্বাস, প্রশান্ত মনোভাব দেখিয়া রামচন্দ্র বুঝিলেন, বিশ্বনাথ পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন।

রামের মন ক্রমশঃ ভগবদ্দর্শনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রাণের এই ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকট আর কেহ নাই। তখন প্রাণের আবেগে তাঁহার সমস্ত অশান্তির কারণ জানাইয়া বলিলেন, "মশাই, আমি হরির দর্শন কেন পাইনি ?

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "তা কেমন করে বলব ? হরিকে পাওয়া না পাওয়া হরির ইচ্ছে, আমি তার কি বলতে পারি ?" রামচন্দ্র ভাবিলেন, পরমহংসদেবের কাছে যিনিই আগমন করেন, তাঁহারই কেমন শান্তি লাভ হয়, তাঁহার নিজের তাহা হয় না কেন ?

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, এতদিন আপনার কাছে যাতায়াত কচ্ছি, আমার কিছু হচ্চে না কেন ?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তা বাপু, না হয় আর নাই আসবে, আমি ত কিছু প্রত্যাশা করিনি কারুর কাছে। তোমার না পোষায় এসো না।" এই কথা বলিয়া তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামচন্দ্র বিশ্ব আঁধারময় দেখিলেন, প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল, জীবন ভারবোধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নিভৃতে অন্ধকারে গঙ্গাতীরে যাইয়া মনে করিলেন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু তাহা করিতে না পারিয়া ভাবিলেন, স্বপ্নে যে মন্ত্র পাইয়াছেন জপ করিবেন। কেনই বা স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র এত দিন নিষ্ঠা করিয়া জপ করেন নাই ! কৈ পরমহংসদেব যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ত তিনি করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা, কেহ এমন পায় না, ওকে বলে স্বপ্নসিদ্ধ। তবে কেন আমি ভগবান্ পাব না, মহাপুরুষের কথা বৃথা হবে কি ? না, কখনই

নয়। আমি তাঁর উপদেশ পালন করিনি, তাই আমি হতভাগা, হরির দর্শন পাইনি।' রামচন্দ্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তিনি সেই সিদ্ধমন্ত্র জপিবার সংকল্প করিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে ঘরে থাকেন, তাহার উত্তর দিকের বারাণ্ডায় অন্ধকারে বসিয়া মন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন।

কতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে জপ করিয়াছেন, জানেন না, হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, সহাস্যবদনে রামকৃষ্ণদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। রামের প্রাণ মহানন্দে মাতিয়া উঠিল, অমনি তিনি তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "দেখ, বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে ভক্তসেবা করগে। আর এখানে যখন আসবে এক পয়সার যা হোগ কিছু কিনে এনো। সাধুস্থানে দেবতার স্থানে শুধু হাতে আসতে নাই।" রামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিতেন, তাঁহাকেই ঐরূপ আসিবার সময় কিছু আনিতে অনুরোধ করিতেন। ক্রমে অনেকেই অনেক রকম ভোজ্যবস্তু আনিতেন, রামকৃষ্ণদেব হয়ত তাহার মধ্যে এক কণা আপনার মুখে দিয়া সমস্তই উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলিতেন।

রামচন্দ্র পুরুষানুক্রমে চৈতন্যদেবের ভক্ত, সেজন্য ভক্তসেবা কাহাকে বলে বেশ জ্ঞাত, কিন্তু সেই ভক্তসেবা করিবার মহা অন্তরায় অর্থব্যয়। সুতরাং সে বিষয়ে ইতস্ততঃই করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গমন কালে শ্যামবাজারের মোড়ের দোকান হইতে রামকৃষ্ণদেবের জন্য জিলিপি ক্রয় করিয়া লইলেন। পথে একটি দরিদ্র বালক সেই জিলিপি দুই একখানি পাইবার আশায় গাড়ির সঙ্গে দৌড়িয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। টালার পুলের উপর পর্য্যন্ত

গিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন, এ বা ভগবানের কোন প্রকার ছলনা হইবে, এই ভাবিয়া ছেলেটিকে দুই একখানি জিলিপি দিলেন, তারপর রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া চুবড়ী শুদ্ধ জিলিপিগুলি একস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সহিত রামচন্দ্রের ঈশ্বর-তত্ত্ব বিষয়ক অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রামকৃষ্ণদেব একটু ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া কিছু জলযোগ করিতে চাহিলেন। রামচন্দ্র অমনি তাড়াতাড়ি সেই চুবড়ি শুদ্ধ জিলিপি তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিলেন। রামকৃষ্ণদেব জিলিপিতে হাত দিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে কয়েকখানি জিলিপি ভাঙ্গিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া হাত ধুইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সে জিলিপি ঘরের এক কোণে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে অন্য কিছু খাইয়া জল পান করিলেন। রামচন্দ্র ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, রামচন্দ্র আর কোন কথা বলিলেন না। কিছু-দিন পরে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এখানকার জন্যে যখন কিছু আনবেক তার আগ্‌ভাগ তুলে কারুকে দিওনা, দিলে উচ্ছিষ্ট হয়, ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না, ভগবানকে না দিয়েও কিছু খাই নি।"

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রামচন্দ্রকে কহিলেন, "ওহে, তোমার ওখেনে গিয়ে আনন্দ করতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে যে। কবে যাব বল দেখি?" এই বলিয়া নিজেই আবার কহিলেন, "দেখ, এই বৈশাখী পূর্ণি-মাতে যাব, কেমন?" রামকৃষ্ণদেব নিজ মুখে বলিতেছেন, রামচন্দ্র অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অর্থব্যয় হইবে ভাবিয়া তাঁহার মন একটু

সঙ্কুচিত হইল। কয়েক দিন পরে হঠাৎ তাঁহার মনে উদয় হইল, ভক্তসেবা না করিলে ভক্তি হয় না, ভক্তসেবা আর ভগবানের সেবা একই। অতএব ঠাকুরের কথামত আগামী পূর্ণিমার দিন ভাল করিয়া উৎসব করিবেন স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পরমহংসদেব বলেন, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে হবে, কিন্তু আমার কি হল, কামিনী ত্যাগ ত হল না, আর কাঞ্চন? তা ত মাইনেটা বেড়ে অবধি সেটা জমাবার চেষ্টা করেছি, মেয়ের বিবাহের যোগাড় করে রাখছি। কিন্তু মাইনেটা বাড়া কি আমার চেষ্টায় হয়েছিল? আমি ত ঠাকুরেরই কাছে মাইনে বাড়াবার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। ও সবই তাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, আমি মাঝে থেকে মিছে মায়ায় পড়িছি। না, ও টাকাকড়ি সবই তাঁর, তাঁর হুকুম মান্‌ব, ভাল করে উৎসব কর্‌ব। ঐ ভক্তসেবা করতে হবে বলেই টাকা এসেছে, জমিয়ে রাখবার জন্যে নয়। এ সংসারে আমার কি আছে? সবই ত তাঁর, আমি কেন মেয়ের বের জন্যে মাথা খুঁড়ি? ও ত তাঁরই কাজ। আমার কাজ পরমহংসদেব যা বলেছেন তাই, ভক্তসেবা। ভক্তসেবা করলে তবে ভক্তি হবে, তবে ভগবান্ লাভ হবে।—প্রভুর কি অপূর্ব্ব উপায়, টাকা খরচ হবে—তাতে ভক্তি লাভও হবে আর কাঞ্চনের মায়াটাও কেটে যাবে। ঠাকুর, এই ত তোমার কৃপা! আমি পাষণ্ড, এত দিন তা বুঝ্‌তে পারিনি।" রামচন্দ্র ভাবে বিভোর হইলেন, চক্ষে অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ যাইয়া রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

রাম সেবার আয়োজন রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিয়া বেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরস্পরের প্রতি সাদর সম্ভাষণ, আলাপ পরিচয় আদর অভ্যর্থনা ভোজ ও যত্নের যে সমস্ত ত্রুটি অন্যত্র লক্ষিত

হয়, সে সকল ত্রুটি কি প্রকারে সংশোধিত হইতে পারে, তাহা রামকৃষ্ণদেবের স্বভাবতঃ কোমল মধুর ও প্রীতিপূর্ণ সংস্পর্শে আসিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অতি বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত আয়োজন করিলেন এবং উত্তম সঙ্কীর্ত্তন গায়কেরও যোগাড় করিলেন। রবিবার সকালে ভক্তেরা স্নানাদি করিয়া একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কেবল ভাবিতেছেন, ঠাকুর কখন আসিবেন। মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত, একবার রাস্তায়, একবার ঘরে, আবার কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্তঃপুরে গমন করিতেছেন, কতক্ষণে রামকৃষ্ণদেব আগমন করিবেন এজন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রামচন্দ্র যেন স্বর্গ হাতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইলেন।

পূর্ব্ব হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন শুনিবার পর রামকৃষ্ণদেব, ভক্তদের তাহাতে যোগ দিতে বলিয়া আপনি আঁকর দিয়া গাহিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব এদিক ওদিক হেলিয়া দুলিয়া আবার কখন বা তালে তালে করতালি দিয়া গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছেন। দর্শকের মনে হইতেছে, যেন রামকৃষ্ণদেবের শরীর অস্থিবিহীন। যখন দক্ষিণ দিকে হেলিতেছেন, মস্তক তাঁহার পদের অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে আবার যখন বামদিকে হেলিতেছেন বোধ হইতেছে, তাঁহার শিরোদেশ প্রায় ভূমি স্পর্শ করিল। পদদ্বয় তালে তালে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আবার কখন "লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা" উদ্দাম নৃত্য, যেন সেই ননীর মত কোমল দেহে সিংহের বল। গানের ভাবের অনুযায়ী তান ও লয় তরঙ্গ, তান ও লয়ের তরঙ্গের সঙ্গে শরীরের তরঙ্গ, তাহার সহিত সমস্ত ভক্তবর্গের মনে ভাবতরঙ্গ,

যেন ভগবৎপ্রেমের বন্যা; ঘর দ্বার পৃথ্বী বায়ু আকাশ সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সেই প্রেমপ্রবাহে স্পন্দিত ও আত্মহারা—একি স্বর্গ না মর্ত্ত্য?

ক্রমে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবসম্বরণ করিলেন, অমনি সকলে শান্ত-ভাবে উপবেশন করিলেন। এইবার তাঁহার মুখে মধুর ভগবৎ প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্র সকলকে প্রসাদ পাইতে আহ্বান করিলেন। প্রসাদ ধারণের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে যখন একে একে সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, তখন রামচন্দ্র সব শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এত আনন্দের পর হঠাৎ সমস্ত ফাঁক হইয়া যাওয়ায় তাঁহার বড়ই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আবার কবে ঐরূপ আনন্দ সম্ভোগ করিবেন। যাহাতে আবার শীঘ্রই ঐরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পান, তাহার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সুযোগ মিলিল। রাম রামকৃষ্ণকে লইয়া পরমানন্দে আর এক দিন উৎসব করিলেন।

রামের গৃহে বারম্বার উৎসবানন্দ আস্বাদ করিয়া অন্যান্য গৃহী ভক্তেরাও ক্রমে স্ব স্ব গৃহে রামকৃষ্ণদেবকে লইয়া গিয়া উৎসব করিতে লাগিলেন। এইরূপ উৎসবে ভক্তগণের পরস্পর মিলনে তাঁহাদের মধ্যে একটা দৃঢ় ভালবাসার সঞ্চার হইতে লাগিল। সপ্তাহান্তে আবার কবে উৎসব হইবে, সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, এবং কোন সূত্রে পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইলে যেন হাতে স্বর্গ পান। এদিকে কিন্তু সকলেই বিভিন্ন ভাবের উপাসক। কেহ হয়ত বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ বা নিরাকারবাদী। রামচন্দ্র ত ঘন ঘন উৎসব করেন, কিছু অর্থ হাতে জমিলেই উৎসবের যোগাড় করেন। কন্যার বিবাহ প্রভৃতির চিন্তায় আর তিনি উদ্বিগ্ন নহেন, অর্থকেও আর তাঁহার দেহের রুধির স্বরূপ জ্ঞান নাই। রামচন্দ্র চিকিৎসা ব্যবসা

করেন না বটে, কিন্তু এই সময়ে অনেকে মেডিকেল কলেজে আসিয়া তাঁহার দ্বারা বহুবিধ দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করাইয়া লন। তার দ্বারা তাঁহার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অর্থের মায়া ত্যাগ করাতেই ঈশ্বরেচ্ছায় যখন তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতেছে, তখন এ অর্থ রামকৃষ্ণদেবেরই অর্থ এবং তাহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার একমাত্র ভক্তসেবা।

একদিন মঙ্গলবার কোন ছুটি উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের ঘরে খুব জনতা হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব কথায় কথায় সমাধিস্থ হইতেছেন, আবার সমাধি ভঙ্গের পর তাঁহার সেই সরল মধুর গ্রাম্য কথায় বেদবেদান্তের সার মর্ম্ম যাহা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, বলিতেছেন, আর সকলে সাগ্রহে শুনিতেছেন, মধ্যে মধ্যে কেহ বা প্রশ্ন করিয়া মনের সন্দেহ মিটাইতেছেন। এক জন বলিলেন, "মশাই, আপনার কাছে এত দূর দেশ থেকে লোক এসে ধন্য হয়ে যায়, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের লোক কৈ আসে না কেন?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "দেখ, যেখানে একটা লাণ্ঠান জ্বলে, তার নীচেটায় অন্ধকার পড়ে আর ঐ দেখ, গরুটা গঙ্গার ধারে বাঁধা আছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও এমন গঙ্গাজল খেতে পায় না, অথচ ছাড়া গরু কত দুর থেকে পালে পালে এসে গঙ্গাজল খেয়ে যাচ্ছে। মায়াবদ্ধ জীবের ভগবৎকথা শুনতে ভাল লাগে না। যতক্ষণ না মায়া যায়, ততক্ষণ ভগবানকে ভুলে থাকে। দেখ, একটা গল্প মনে পড়ল। একজন পথিক অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এক কল্পবৃক্ষের তলায় এসে বস্‌ল। বসে মনে করলে, আঃ, এই সময় একঘটি সরবত পাই ত খেয়ে প্রাণটা জুড়ুই। যেমন মনে হওয়া, অমনি এক ঘটি ঠাণ্ডা সরবত সামনে হাজির! পথিক আশ্চর্য্য হয়ে সেটা খেয়ে

বেশ ঠাণ্ডা হল। তখন আবার মনে হল, একটী বেশ সুন্দরী স্ত্রী পাই ত বড় মজা হয়। যেমন মনে হওয়া আর অমনি একজন পরমা সুন্দরী স্ত্রী সাম্‌নে দেখতে পেলে। পথিক মনে করলে, "বা বা, এ ত বেশ মজা" এই ভাবে তার সঙ্গে বেশ আনন্দ করছে এমন সময় হঠাৎ মনে ভয় হল, ভাবলে—এই নির্জ্জন জায়গায় যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে আমায় খেয়ে ফেলে! যেমন ভাবা, আর অমনি এক প্রকাণ্ড বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেল্‌লে। তা ভগবান্ যেন কল্পতরু, আর তাঁর কাছ থেকে যে যেমন ভাবে, তার তাই হয়। যে ভাবে—আমি পাপী, সে পাপীই হয়; যে ভাবে—আমি বড়ই দুর্ব্বল আমার কোন ক্ষমতা নেই, সে দুর্ব্বলই হয়ে পড়ে, আবার যে ভাবে আমার সমস্ত অভাব সেই ঈশ্বরই পূরণ করেন, সত্যই তার সমস্ত অভাব ভগবান্ মোচন করেন। চাই দৃঢ় বিশ্বাস। এক বুড়ী গয়লানী শুনেছেল, রাম নাম করে যা কর তাই হয়। এক দিন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করে মুষলধারে বিষ্টি হচ্ছে। তাকে একটি নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে যেতে হত। সে দিন ঐ দুর্যোগে একটিও নৌকা পেলে না। বুড়ী ভাবলে রাম নামে ভব সাগর পার হয়, আর আমি এই ছোট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয় পার্‌ব। সে রাম রাম কর্‌তে কর্‌তে নদী পার হয়ে গেল। যে পণ্ডিতের বাড়ী দুধ দেয়, সে বল্লে, 'বুড়ী, তুই এই দুর্য্যোগে কেমন করে এলি?' বুড়ী বল্লে, 'কেন বাবা ঠাকুর, আমি রাম রাম করে পার হয়ে এলুম।' বামুন অবাক্ হল। অপর পারে পণ্ডিতের কিছু কাজ ছেল, সে বল্লে 'হ্যাঁগো, আমিও কি রাম রাম করে পার হতে পার্‌ব না?' বুড়ী বল্লে, 'তা কেন পার্‌বে না।' এই বলে দুজনে নদী পার হতে গেল। বুড়ী রাম রাম করে পার হতে লাগল, বামুনও রাম রাম করে যেতে লাগ্‌ল, জলে নেবেই কিন্তু

বামুন কাপড় গুড়িয়ে নিলে। বুড়ী অমনি বল্লে, ঠাকুর রাম রামও কর্‌বে, কাপড়ও সাম্‌লাবে, তাহলে হবে না। বামুনের নদী পার হওয়া হল না। ঐ বুড়ীর মত বিশ্বাস চাই, আর বামুনের মত রামও বল্‌ব কাপড়ও সামলাব, তাহলে চল্‌বে না।" এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তার পর সন্ধ্যার সময় সকলে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র সেদিন আরও একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আজিকার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে এক মহা তুফান উঠিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, "তাই ত, আমিও ত সেই কল্পতরু তলে বসে ভাবছিলুম, কেন হরির দর্শন পাইনি, তাই এত অশান্তি এসেছেল। ইনিই ত সেই হরি, জীবের উদ্ধারের জন্য দেহ ধারণ করেছেন। ওঁর সমস্ত কার্য্যে আর কথায় তাই প্রমাণ হচ্ছে। আমি ত মহা সৌভাগ্যশালী যে, এঁর এই লীলা দেখছি। এমন প্রকট বিগ্রহ ছেড়ে আমি কি করছিলুম। আর না; আর ভুল্‌ব না। প্রভু বল দিও, যেন না ভুলি।"

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে পশ্চিমের চাতালে আসিলেন, দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবও সেই-দিকে আসিতেছেন। অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন "রাম, তুমি কি চাও?" তাঁহার সহাস্য বদন ও অপরূপ দয়াল ভাব দেখিয়া রাম কৃতার্থ বোধ করিলেন, ভাবিলেন, "ভগবান্ পেয়েছি, ভগবানের কাছে আবার চাইব কি? যে ভগবান্ পায়, তার বাকী কি থাকে?"

রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "রাম, তুমি কি চাও? যা চাও পাবে। কি চাও?" রাম তত্রাচ নির্ব্বাক্। কি চাহিবেন জানেন না, কেবল তাঁহার মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাব দেখিতেছেন আর

বিমোহিত হইতেছেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "কি আর চাইব প্রভু, আমার কিসে কল্যাণ হবে, তা আপনি জানেন, আমি জানিনি, আপনি বলে দিন কি চাইব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, রামচন্দ্র বিশ্বসংসারে আপনাকে যেন বালকের অপেক্ষা নিরাশ্রয় কেবলমাত্র রামকৃষ্ণরূপী মাতার আশ্রয়ে আশ্রিত দেখিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "রাম, তুমি আমার দেওয়া মন্ত্রটী আমায় ফিরিয়ে দেও।" এই বলিয়া হাত পাতিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন ; রাম তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই মন্ত্রটি পদযুগলে অঞ্জলি দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। রামকৃষ্ণদেবও অমনি তাঁহার দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ রামের শিরোমণির উপর রাখিলেন। কতক্ষণ এই ভাবে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন, রামচন্দ্র জানেন না। কিছুক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিয়া পা সরাইয়া লইলেন, রামচন্দ্রও গাত্রোত্থান করিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আমাকে দেখ।" রামচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টদেবতা তাঁহার সম্মুখের। রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, "তোমার আর জপ তপ কর্‌তে হবে না। কেবল এখানে এলে গেলেই হবে।"

দক্ষিণেশ্বরের কিছু উত্তর কামারহাটিতে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বাস করেন। পটলডাঙ্গার গোবিন্দ দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গার তীরে যে বাগান আছে, তাহারই একটি ঘরে তিনি থাকেন। দিবা নিশি ইষ্ট নাম জপ ব্যতীত ইঁহার আর কোনও কার্য্য নাই। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথায় কথায় শুনিলেন, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির বাগানে একজন পরমহংস সাধু আছেন, অসংখ্য লোক প্রত্যহই তাঁহাকে দর্শন করতে আসে, আর যে আসে, তাঁহার কথায় মুগ্ধ হয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত। বৃদ্ধাও একদিন

তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, ভস্মমাখা সাধু নহে, গৃহস্থের মত সাদা কাপড় পরা একজন লোক, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া বৃদ্ধার মনে হইল, লোকটি বেশ, নিকটে বসিয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া প্রাণ মন গলিয়া গেল, সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতে আর যেন মন চাহে না। রামকৃষ্ণদেব বৃদ্ধার পরিচয় লইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং তাঁহার হস্তে একটি প্রসাদী সন্দেশ দিয়া বলিলেন, "মা, আবার এখানে আস্‌বে ত ?" বৃদ্ধা কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা আবার আস্‌ব।" সন্দেশটি হস্তে লইয়া বৃদ্ধা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু সেটি নিজে না খাইয়া অন্য কাহাকে দিলেন। ব্রাহ্মণীর বড় নিষ্ঠা, স্বপাকে একবেলা আহার, দরিদ্র বটে কিন্তু কাহারও নিকট পরিগ্রহ করেন না, কাহারও ছোঁয়া খান না। রাসমণি কৈবর্ত্ত, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্ন ভোজন করেন, হয়ত রামকৃষ্ণ কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধা কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেমন করিয়া কৈবর্ত্তের দ্রব্য খাইবেন ? এই জন্য সেই সন্দেশটি অপর এক-জনকে খাইতে দিলেন।

সন্ধ্যার আগেই বৃদ্ধা আপনার ঘরে বসিয়া ইষ্ট নাম জপ করিতে বসিলেন। ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া জপ করেন আর মনটি পিছলিয়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে হাজির হয়, তাঁহার মিষ্ট কথা শুনিতে থাকে, তাঁহার সহিত নানা কথা কয়। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন, এ কি বিপদ্‌! কোথায় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিব, ইষ্টমূর্ত্তিরই চিন্তা করিব, তাহা না করিয়া মন রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে গিয়া উপস্থিত হয়! বৃদ্ধা মনকে ধিক্কার দিলেন, ইষ্টদেবের চিন্তাই করিতে বসিলেন; আবার জপ আরম্ভ করিলেন, ক্ষণিক পরে আবার মন সেই রামকৃষ্ণের বালকের ন্যায় মূর্ত্তির কাছে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় কথা শুনিতে গেল।

ব্রাহ্মণী ইষ্টমন্ত্রের বেড়া বাঁধিয়া মনকে আটক করিলেন, ভাবিলেন, আর ভয় নাই বার বার অমন অন্যায় হইবে না। কিছুক্ষণ সন্তুষ্টচিত্তে জপ করিয়া বৃদ্ধা দেখেন, চোর মন আবার পলাইয়াছে, মনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন কিন্তু সে রাত্রে আর জপ করা হইল না, ভাবিলেন, সন্ধ্যার সময় একটু নিদ্রা যাইলে মনটা শান্ত হইবে, পরে গভীর রাত্রে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। এই ভাবিয়া বৃদ্ধা নিদ্রিতা হইলেন।

গভীর নিশিথে আবার জাগ্রত হইলেন, যেন কি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন। "কি বিপদ! দক্ষিণেশ্বরের সাধু কে? স্বপ্নেও যে তাকে এড়াতে পারি নি!" এই বলিয়া বৃদ্ধা গঙ্গাজলে আচমন করিয়া আবার জপ করিতে বসিলেন। গ্রীষ্মকাল জ্যোৎস্না রাত্রি, জানেলায় স্পষ্ট জ্যোৎস্না দেখা যাইতেছে, চন্দ্রালোক দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণী মনকে অনেক শান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষাণিকক্ষণ জপের পরেই আবার চিদাকাশে সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব। কেন এমন হইতেছে, কত সাধু শাস্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন করিয়া জপের ব্যাঘাত কেহই উৎপাদন করে নাই। ভাবিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন না, এবং এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ভাগীরথীর তীরে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন ও জপ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা জপে সিদ্ধ, দিবা নিশি জপ করেন, একবার মাত্র দুইটি অন্ন প্রস্তুত করিয়া ইষ্টদেবতার ভোগ দেন, আর অন্য সময় ক্রমাগত নাম জপ করেন। অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই অনুষ্ঠান। কিন্তু আজি সেই জপে ব্যাঘাত উপস্থিত। দক্ষিণেশ্বরের সাধু কিছুতেই মন স্থির হইতে দেয় না, জপ করিলেই সেই মূর্ত্তির উদয়। জপ করা হইল না। মনকে ধিক্কার দিতে দিতে রাত্রি প্রভাত হইল, দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মনে করিলেন, "না,

আজ আর দক্ষিণেশ্বরে যাব না।" কিন্তু মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিতে লাগিল, "তা হোগ, একবার যাই, কি আশ্চর্য্য সাধু,আহা, বাছার আমার দোষ কি ? হয়ত পূর্ব্ব জন্মের কে ছিল, তাই এত মন টান্‌ছে।" আবার ভাবিলেন, "না, ছি ! তিন কাল গিয়েছে কবে আছি, কবে নেই, ভগবানের ধ্যানে ব্যাঘাত, আমার গোপালের দর্শন না পেলে আবার জন্মাতে হবে, আমার গোপালকে ভুলে থাকব ? না যাব না।" অন্তরে এইরূপ দ্বন্দ্ব লইয়া ভগবানের ভোগ রাঁধিলেন, তাহা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন। পরে প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক প্রতিবেশীর কন্যা আসিয়া সম্বাদ দিলেন, সকলে খড়দহে শ্যামসুন্দর দর্শনে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণীও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। তথায় শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "প্রসাদ পেলে তখনি তাহা ধারণ কর্‌বে, প্রসাদে কোন বিচার চলে না, তাই শ্রীক্ষেত্রে কোন জাত বিচার নেই, প্রসাদ যে দেবে, নিতেই হবে।" ব্রাহ্মণীর বক্ষে শেল বিন্ধিল। তিনি বুঝিলেন, তবে ভগবানের প্রসাদ সে সাধু দিয়াছিলেন, তাহা কৈবর্ত্ত ব্রাহ্মণের হাতের দ্রব্য ভেবে অন্যকে দিয়াছি। বিষম অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধা পর দিন কিছু মিষ্টান্ন লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র রামকৃষ্ণদেব বালগোপালের ভাবে বিভোর হইয়া মাতৃ সম্বোধনে ব্রাহ্মণীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "কৈ মা, কি এনেছ মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" ব্রাহ্মণীর চক্ষে জল আসিল, ভাবিলেন, "এই কি গোপাল, আমি যে এমনি করেই তাকে খাওয়াতে চাই," এবং অঞ্চল হইতে মিষ্টান্ন লইয়া "গোপাল গোপাল" বলিয়া রামকৃষ্ণদেবের মুখে তুলিয়া দিলেন, তিনিও বালকের মত তাহা পরম

পরিতোষের সহিত ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর দুই জনে একত্রে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীর প্রাণ ক্রমে আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"বাবা তুমি কে, আমায় বলে দাও। আমার প্রাণ বড়ই আকুল হয়েছে।" রামকৃষ্ণদেব কহি-লেন, "মা তোমার কি মনে হয়?" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "বাবা, আমি মনে করি, তুমি আমার গোপাল এসেছ। জীব উদ্ধার কর্‌তে এসেছ।"

রামকৃষ্ণদেব ঈষৎ ভাবযুক্ত হইয়া কহিলেন, ঐ কথা সেই ব্রাহ্মণীও বোল্‌ত, আবার বৈষ্ণবচরণও বলে।" ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, যেন বহু দিনের বাঞ্ছিত বস্তু হাতে পাইয়া মাতিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাবা, তাই আমি গোপালের ধ্যান করি, জপ করি, আর তোমায় দেখি। পোড়া কপাল, আমি কি ছাই তা জানি বাবা। কাল তাই তুমি আমায় প্রসাদ দিলে আর আমার কুবুদ্ধি হল, ভাবলুম কৈবর্ত্তের বামুনের হাতে শেষ দশাটায় খাব, তাই বিলিয়ে দিলুম।" এই বলিতে বলিতে সজল নয়নে রামকৃষ্ণদেবকে খাওয়াইয়া যে কণিকা-গুলি তাঁহার হস্তে লাগিয়াছিল, তাহা আপনার মস্তকে ও জিহ্বায় স্পর্শ করিলেন। এই দিন হইতে রামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপাল বলিয়া ডাকিতেন এবং রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে গোপালের মা বলিয়া ডাকিতেন। বিদায় কালে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, "গোপালের মা, তোমার হাতে তরকারী খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। এবার যখন আস্‌বে মিষ্টি এন না, তরকারি রেঁধে এন।" ব্রাহ্মণী দরিদ্রা, আত্মীয়েরা কিছু সামান্য অর্থ সাহায্য করে, তাইতেই তাঁহার দিনপাত হয়। বাড়ী আসিয়া গোপালের জন্য ব্যঞ্জন রাঁধিবার যোগাড় করিলেন, উচ্ছে আলু ও শাক। পরদিন উহার চচ্চড়ি রাঁধিয়া লইয়া গেলেন। রাম-

কৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি বালকের মত অতি তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলেন।

গোপালের মা অতি বৃদ্ধা, প্রতিদিন কামারহাটি হইতে দক্ষিণেশ্বর গমন করিতে পারেন না। এক দিন বেলা অধিক হইয়াছে ভাবিয়া ঠাকুরের ভোগ রাঁধিবার জন্য ব্যস্তভাবে বাগান হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যাইতেছেন, বাহিরে আসিয়া দেখেন, একটি সুন্দর অষ্টমবর্ষীয় বালক কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে মাতা সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে দিল। বৃদ্ধা বালকের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া আপন ঘরের মধ্যে রাখিলেন। আরও কতকগুলি আনিবার জন্য বাহির আসিলে আর সে বালককে দেখিতে পাইলেন না। "ছেলেটী কে? ঠিক যেন আমার গোপাল মনে হয়," এই ভাবিয়া আবার কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। বালক আবার "মা, এই যে আমি, বড় খিদে পেয়েছে মা, কিছু খাবার দে মা" বলিয়া বৃদ্ধার অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল। বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া বালকের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, বলিলেন, "বাবা গোপাল, আমার ঘরে ক্ষীর ননী নেই বাবা, তোমায় দেব এমন জিনিষ আমার কি আছে বাপ?" বলিতে বলিতে বৃদ্ধা গদগদ হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। গোপাল ছাড়ে না, বলে, 'মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তুই আমায় যা হয় কিছু খেতে দে মা।" বৃদ্ধা ঘরে আসিয়া হাঁড়ির মধ্যে দুই চারি খানি বাতাসা ছিল তাহাই গোপালকে দিলেন। গোপাল মহা সন্তোষে তাহা খাইতে খাইতে বলিল, "চল মা, আমরা আরও কাঠ কুড়িয়ে আনি।" দুইজনে আরও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃদ্ধার রন্ধনের সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিতে লাগিলেন, "আমার গোপাল কত খেলাই জানে। দক্ষিণেশ্বরে এক রকম, আমার ঘরে

এক রকম, গোপাল আমি আজ থেকে তোমার জন্যে ভাল করে তরকারী রাঁধব, খাবি ত বাবা?" ইত্যাকার আপনাপনি বলিতে বলিতে রন্ধন করিলেন। গোপালের জন্য ভোগ দিতে বসিলেন, চক্ষু মুদিয়া সে দিন আর ধ্যান কে করে? কল্পনার পূর্ব্বেই "মা, আমি এসেছি' বলিয়া গোপাল আসিয়া ভোগ খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী সজল নয়নে দেখিতে ও প্রেমে বিভোর হইতে লাগিলেন।

এই সময় প্রতাপ চন্দ্র হাজরা নামে একজন রাসমণির উদ্যানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। জপ তপ সাধন ভজনে তাঁহার বড়ই প্রবল বাসনা, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "এখানে মেকি চলে না।" হাজরার গৃহে কিছু অর্থের অনাটন, মনে বিশ্বাস--রামকৃষ্ণদেবের মত সাধন ভজন করেন আর দশজনে তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া সম্মান করিয়া তাঁহার ঘরের অভাবগুলি মোচন করিয়া দেয়। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, "আলে গর্ত্ত থাকলে ক্ষেতে যতই জল দেওনা কেন, সবই সেই গর্ত্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাসনা থাকতে যতই জপ তপ কর না কেন, কিছুই হয় না।" হাজরা সে কথায় কান দেন না, দিবা নিশি জপ করেন, আবার মধ্যে মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মচারী ভক্তদিগকে বিপরীত উপদেশও করেন। রামকৃষ্ণদেব কিন্তু তাঁহাকে জপ করিতে দেখিলেই আস্তে আস্তে কাছে গিয়া মালাটী কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করেন, হাজরা মহা বিরক্ত হইয়া মালার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হন। তাঁহার সময়ে সময়ে মনে হয় রামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা তিনি উন্নত, তাঁহার কাছে আবার শিক্ষা কি করিবেন?

রামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায় প্রতি দিনই সহস্র সহস্র লোক গমন করেন। এই সমস্ত লোকেরা প্রত্যেকে আপনাপন মনের আকাঙ্ক্ষা-

সুযায়িক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছেন। ভবনাথ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধরচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই সময় তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন। ভবনাথের নিবাস বরাহনগর, বয়ঃক্রম ষোল বা সতর বৎসর, তাঁহার বাড়ীর অপর সকলেই রামকৃষ্ণদেবকে পাগল বলিয়াই বিশ্বাস করেন। ভবনাথ ছেলেমানুষ, রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমনাগমন করিলে ভবনাথের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহাই তাঁহার বাড়ির সকলের ধারণা, সুতরাং তাঁহার নিকট যাইতে দেন না। কিন্তু ভবনাথ লুকাইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। ক্রমে তিনি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, কখন কখন তাঁহার নিকট রাত্রিবাসও করেন এবং সে জন্য গৃহে অশেষ প্রকার লাঞ্ছিতও হন। কিন্তু তথাপি তাঁহার রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভালবাসার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিল না।

একদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, মনোমোহন এবং ক্রমে অন্যান্য লোকও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "দেখ, ভক্তি যদি দেখতে হয়ত এই সুরেশকে দেখ," মনোমোহন জানিতেন, তাঁহার মত ভক্ত কেহই নাই, কারণ, ইতিপূর্ব্বে যখন সুরেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করেন নাই, তখন একদিন রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, মনোমোহনের বড় ভক্তি। মনোমোহন অদ্য সুরেন্দ্রের প্রতি রামকৃষ্ণদেবের এ প্রকার উক্তি শুনিয়া ভাবিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সুরেন্দ্র অপেক্ষা কম ভক্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভক্ত মনোমোহন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন, "তবে ঠাকুর, আমার আর এখানে মিছে আসা। ভক্তি বল, বিশ্বাস বল, প্রেম বল, সবই ত তোমার দেওয়া। তুমি আমায় ভক্তি যদি না দিলে ত কেন মিছে

এখানে আসি ? আর আস্‌ব না !” মনোমোহন মিত্র এই অভিমান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রতি রবিবারেই আসিতেন এক রবিবার তিনি আগমন না করায় রামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রতিবেশী-দের নিকট তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁগা, মনোমোহন কেন আসেনি ?” রামচন্দ্র কহিলেন, “বোধ হয়, শরীরটা ভাল নেই।” রামকৃষ্ণদেব অমনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “দেখ খবরটা নিও, সে কেমন আছে, আর এখানে বলে পাঠিও।” রামচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সম্বাদ পাইলেন, মনোমোহন ভাল আছেন, কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা নাই। রামকৃষ্ণদেব এই সম্বাদ পাইয়া একজন লোক দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনোমোহনের অভিমান আরও বাড়িয়া গেল। “তুমি ভক্তের ঠাকুর, আমার কে ? তুমি বলে থাক, ‘মানুষ এক পা ভগবানের কাছে অগ্রসর হলে ভগবান্ দশ পা এগিয়ে আসেন।’ সব মিছে কথা, তোমার কাছে সব সমানও নয়, ছোট বড়ও আছে। তা থাক্ আমি যেমন তেমনি থাকি, ঘরে থাকি, তোমার কাছে গিয়ে কি হবে ?” এই রূপ চিন্তা যতই করেন, ততই রামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁহার অভিমান বাড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণদেব আরও দুই এক জন লোক পাঠাইলেন। মনোমোহন দেখিলেন, কলিকাতায় থাকিলে তাঁহার নিকট রামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণ আসিয়া বিরক্ত করেন। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কোন্নগরের বাটীতে গিয়া রহিলেন এবং তথা হইতে রেলযোগে কলিকাতায় কার্য্যস্থলে গতায়াত করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার অভিমান বাড়িতে লাগিল, মনকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, ভগবান্ জীবের জন্য লালায়িত হন না; যদি হইতেন, তাহা হইলে

তিনি গৃহে বসিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করিতেন। ক্রমে অভিমান যন্ত্রণায় পরিণত হইলে ভাবিলেন, "এও ত বড় জ্বালা, ও চিন্তাই ত্যাগ করে দেও মন, কেউ কারুর জন্যে লালায়িত হয় না। আমার জন্যে আমি ছাড়া আর কে তেমন ভাবে?" কিন্তু মন বুঝে না। যতই চেষ্টা করেন, ততই অভিমান বাড়িয়া যায়। হয়ত কোন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, মন সেই বিষম অভিমানের চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, কতবার চেষ্টা করিয়া মনকে ফিরাইলেন, কিন্তু ক্ষণিক পরে দেখিলেন, হস্তের কার্য্য কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নাই, সেই চিন্তাই করিতেছেন। চমক ভাঙ্গিয়া গেল, আবার কার্য্যে মন দিলেন। দিন দিন তাঁহার এই অন্যমনস্ক অবস্থা বাড়িতে লাগিল। যে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যের মধ্য হইতেই রামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলি একে একে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে, অমনি অভিমান হৃদয় জুড়িয়া বসে আর আপনার উপর ক্রোধ হয়, মনে হয়, আবার সেই চিন্তা! চিন্তার হস্ত হইতে এড়াইবার জন্য যে কার্য্য অবলম্বন করেন, সেই কার্য্যের ভিতর হইতেই রামকৃষ্ণ উদয় হন। এক দিন সকালে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, পতিতপাবনী মোক্ষপ্রদায়িনী ভাগীরথীর যে গুণকীর্ত্তন রামকৃষ্ণদেবের নিকট শুনিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পতিতপাবন মূর্ত্তিও মনে উদয় হইল। মনোমোহন তৎক্ষণাৎ সমস্ত ভ্রান্ত বলিয়া মন হইতে তাহা জঞ্জালবৎ বিদূরিত করিতে প্রয়াস করিলেন। এমন সময় ঈষৎ দূরে একখানি নৌকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, মনে হইল, একজন পরিচিত লোক তাহার মধ্য হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া অপর এক জনের সহিত কথা কহিতেছেন; নৌকাখানিও যেন তাঁহারই দিকে আসিতেছে। একটু পরেই দেখিলেন, নিরঞ্জন সেই পরিচিত ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি রামকৃষ্ণদেব।

মনোমোহনের রোমাঞ্চ হইল। নিরঞ্জন নৌকার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "মশাই, আপনি যান না কেন ? এই দেখুন, উনি আপনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।" দারুণ গ্রীষ্ম, রামকৃষ্ণদেব পাখার বাতাস খাইতেছিলেন, মনোমোহনের নিকটস্থ হইয়া ভাবে মগ্ন হইলেন, সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইল। মনোমোহন অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া ছিলেন, নিরঞ্জনের কথায় তাঁহার চক্ষে বারিধারা বহিতে লাগিল, তিনি ভাবিলেন, "আমার জন্যে ইনি এত কষ্ট কোরে আমাকে নিতে এসেছেন! কি অন্যায়ই করেছি, এঁকে কত কষ্টই দিয়েছি।" মনোমোহনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। নিরঞ্জন নৌকা হইতে লাফাইয়া মনোমোহনকে ধরিলেন। রামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, "নিরঞ্জন, ওকে ধরে নৌকায় তুলে আন।" নিরঞ্জন মনোমোহনকে বিভোরাবস্থায় নৌকায় তুলিলেন। মনোমোহনের চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "মনোমোহন, তোমার জন্যে অস্থির হয়েছিলুম তাই তোমাকে নিতে এলুম।"

মনোমোহন তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আমার বড়ই অভিমান হয়েছিল।" আর বলিতে পারিলেন না, আবার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল, রামকৃষ্ণদেবও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন, নৌকা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেল।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জাতিতে বৈদ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্যামবাজার শাখা-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন, মনে কিন্তু বড়ই অশান্তি। বিদ্বান্ লোক, তাহার উপর ইংরাজী পড়া বিদ্বান্, আবার তাহার উপর ইংরাজী বিজ্ঞান শাস্ত্রপাঠে হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজা এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বরবাদ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারিলে পাণ্ডিত্যের

পরিচয় যথেষ্ট হয়, এরূপ একটা ঢেউ এই সময় প্রায় সমস্ত শিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় সেই পাশ্চাত্য ঢেউয়ে গা ঢালিয়া দিয়া আপনাকে খুব শ্রেষ্ঠ ও উন্নত মনে করিতেছেন। এখন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ, তাই স্বগৃহ ছাড়িয়া তাঁহার ভগিনীর শ্বশুর বরাহনগরের ঈশান কবিরাজের বাটীতে দিনকয়েকের জন্য বাস করিতে গেলেন। তথায় যাইয়া একটু শান্তিবোধ করিলেন।

মহেন্দ্রনাথের বয়ক্রম তখন প্রায় ত্রিশবৎসর, দেখিতে সুশ্রী, আয়ত রক্তিম লোচন, সুন্দর মুখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লম্বমান শ্মশ্রুজাল। বরাহনগরে যাইয়া দুই চারিদিন পরে এক রবিবারে তত্রস্থ জনৈক পরিচিত ব্যক্তির সহিত এ বাগান ও বাগান বেড়াইতে বেড়াইতে নানা গল্প করিতেছেন আর সঙ্গীকে বাগানের শোভা দেখাইয়া বলিতেছেন, "আচ্ছা, এর চেয়ে আরও ভাল কোন বাগান এখানে আছে?" সঙ্গী কহিলেন, "আছে, রাণী রাসমণির বাগান, যেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংস থাকেন।" মাষ্টার রামকৃষ্ণদেবের নাম আরও বারকয়েক শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস,সেকেলে বুজরুকী, কুসংস্কার বই ত নয়, কাজেই পরমহংসের কথা শুনিয়া তাঁহার বিশেষ কিছু কৌতূহল হইল না। তবে রাসমণির বাগানবাড়ী বড়ই সুন্দর শুনিয়া উহা দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। সঙ্গীকে বলিলেন—"তবে চল, রাসমণির বাগান দেখে আসি।" এই বলিয়া দুইজনে বাগানে উপস্থিত হইলেন এবং এক এক করিয়া সমস্ত স্থান দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকাল। বেল, যুঁই, চামেলি প্রভৃতি প্রাণমাতান ফুল চারিদিকে প্রস্ফুটিত, বাগানের কোলেই ভাগীরথী প্রবাহিত, মাষ্টারের মনে কবিতার ভাব জাগিয়া উঠিল, অমনি দূর হইতে দৃষ্টি পড়িল, একটী ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রে বসিয়া

আছেন। শুনিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট বহু লোক আগমন করেন আর তাঁহার ঈশ্বরীয় কথায় মুগ্ধ হন। এতক্ষণে মাষ্টারের মনে পরমহংসকে দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল, ভাবিলেন, সাধু কি বলেন, শুনিতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ঘরের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, ঘরটী জনাকীর্ণ. সকলেই চিত্রার্পিতের মত একদৃষ্টে রামকৃষ্ণদেবের মুখপানে তাকাইয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছেন। রামকৃষ্ণদেব তখন বলিতেছিলেন. "যখন একবার ভগবানের নাম করলেই রোমাঞ্চ কি অশ্রুপাত হয়, তখনই ভগবান্ লাভের আর দেরি নেই জেন। ভগবান লাভ হলে, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়, সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা আর কিছুই কোরতে হয় না। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় হয়। তখন ওঙ্কার জপ্‌লেই হয়।" সরল ভাষায় গভীর ভাবপূর্ণ কথা শুনিয়াই মহেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "এমন সুন্দর কথা ত কখন শুনিনি।" এই কয়টী কথা শুনিয়াই তাঁহার নিকট পরমহংসের সমস্ত সুন্দর বোধ হইতে লাগিল, মন মুগ্ধ হইয়া গেল, সে স্থান হইতে আর নড়িতে পারিলেন না। কিন্তু সন্ধ্যা আগত প্রায়, দর্শকেরা সকলেই রামকৃষ্ণের কথাবসানে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া মাষ্টার দেবালয়গুলি দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়া বাগানে অপরাপর স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। এদিকে সায়ং সন্ধ্যার আরাত্রিক আরম্ভ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল, মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে কবিতার পূর্ণোচ্ছাস উদয় হইল। তাঁহার সঙ্গীটী তাঁহাকে এই দেবালয় সংক্রান্ত অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। মাষ্টার মহাশয় যাহা শুনিতেছেন, যাহা দেখিতেছেন, সকলই যেন তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব প্রীতি প্রদান করিতেছে। সন্ধ্যার আরাত্রিকের পর মহেন্দ্রনাথ আবার

রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের নিকট আসিলেন, দেখিলেন, দ্বার ভেজান রহিয়াছে, মন্দিরের দাসী বৃন্দে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মানা, এবং ঘরের ভিতর হইতে ধুনার সৌরভ আসিতেছে। মাষ্টারের ইচ্ছা—ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি একজন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি। বিনা অনুমতিতে কাহারও ঘরের রুদ্ধদ্বার খোলা মার্জ্জিত ইংরাজ নীতি বিরুদ্ধ, তাই ঘরে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা বৃন্দেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, এই ঘরেই সাধুটী আছেন ?"

বৃন্দে কহিল, "হ্যাঁ, এই ঘরে আছেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "ইনি এখানে কতদিন আছেন ?"

বৃন্দে উত্তর করিল, "অনেক দিন আছেন।"

মাষ্টার মহাশয়ের ধারণা, বই না পড়িলে কি মানুষ মানুষ হয় ? নিশ্চয় সাধুটী খুব বিদ্বান্, তাই বৃন্দেকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা ইনি বুঝি খুব বই টই পড়েন ?"

বৃন্দে একটু হাসিয়া বলিল, "আর বাবা বই টই, ওঁর সবই মুখে মুখে ?"

মাষ্টার আরও মুগ্ধ, বৃন্দের কথা বিশ্বাসও করিতে পারেন না, অবিশ্বাসও করিতে পারেন না, কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল ; বৃন্দেকে বলিলেন, "হ্যাঁগা, আমরা তাঁর কাছে যাব, তুমি কি তাঁকে একবার খবর দেবে ?"

বৃন্দে কহিল, "কেন ? যাওনা বাবা, ঘরে গিয়ে বোস।" মহেন্দ্র বৃন্দের কথায় সাহসী হইয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একাকী উপবিষ্ট। ধুনা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই করযোড়ে প্রণাম করিলেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের বসিতে বলিয়া মহেন্দ্রনাথের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণদেব ভাবে মগ্ন থাকেন

সুতরাং কথা কহিতে মাঝে মাঝে তাঁহার ভাবান্তর হইতে লাগিল, যেন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইতেছেন। মাষ্টার তাহার ভাবাবস্থার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহেন, তাই ভাবিলেন, রামকৃষ্ণদেব বুঝি এখন সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা করিবার সময় রামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার উপস্থিতি 'অনধিকার প্রবেশ' সুতরাং এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য পাছে হয়, এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এখন সন্ধ্যা কোর্‌বেন ?"

রামকৃষ্ণদেব অল্প ঘোরের অবস্থাতেই কহিলেন, "না, সন্ধ্যা, না, এমন কিছু নয়।" আর দুই একটী কথা বার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম-পূর্ব্বক বিদায় লইলেন রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আবার এস।"

পুস্তক পাঠ না করিয়া এত জ্ঞানের কথা—বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাষ্টার মহাশয় মনে করিলেন, আবার আসিবেন, বড়ই আকৃষ্টবোধ করিলেন। মনে করিলেন, কাল কি পরশু আবার আসিবেন।

দুই এক দিন পরেই এক দিন প্রাতঃকালে মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "তুমি এসেছ, এখানে বোস।" মহেন্দ্র দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব একটু তোতলা, কিন্তু সেই তোতলামিই যেন তাঁহার কথার মিষ্টতা সম্পাদনে এক অমূল্য উপকরণ।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি এখানে কোথায় আছ ?"

মহেন্দ্র উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, এখানে দিদির বাড়ী আছি—ঈশেন কোবরেজের বাড়ী ?"

রামকৃষ্ণদেব। "ও, ঈশেন কোবরেজের বাড়ী ? হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে ? তার বড় অসুখ হয়েছেল।"

মাষ্টার। আমিও শুনেছিলুম বটে, এখন বোধ হয় ভাল আছেন।

রামকৃষ্ণদেব। "আমি আবার মার কাছে কেশবের জন্য ডাব

চিনি মেনেছিলুম। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর মার কাছে কেশবেয় জন্যে কাঁদতুম, বোলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দে, কেশব না থাকলে আমি কোলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা কব।” এই প্রকার নানা কথার পর রামকৃষ্ণদেব হঠাৎ কহিলেন, “হ্যাঁগা, তোমার বিয়ে হয়েছ ?”

প্রশ্নে মাষ্টারেব মন একটু আশঙ্কিত হইল, তিনি বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

রামকৃষ্ণদেব। “ওরে রামলাল, যাঃ, বিয়ে কোরে ফেলেছে।”

মহেন্দ্রের আশঙ্কা বাড়িল, তিনি মহা অপরাধীর মত অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন, ভাবিলেন বিবাহ করা কি এতই অন্যায় !

রামকৃষ্ণদেব আবার জিজ্ঞাসিলেন, “ছেলে হয়েছে ?”

মাষ্টারের মুখে যেন আর কথা সরে না, ধীরে ধীরে অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ হয়েছে !”

রামকৃষ্ণদেব আবার বলিয়া উঠিলেম, “ওরে যাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।”

মহেন্দ্রনাথ যেন মহা অপরাধে তিরস্কৃতের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। রামকৃষ্ণদেব আবার কহিলেন, “দেখ, তোমার লক্ষণ টক্ষণ বেশ ছেল—আচ্ছা তোমার বউ কেমন ?”

মহেন্দ্রনাথ। “আজ্ঞে ভাল, তবে অজ্ঞান।”

রামকৃষ্ণদেব একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, “আর তুমি বুঝি জ্ঞানী”। মাষ্টারের বিদ্যাভিমান চূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বিনীতভাবে নিস্তব্ধ রহিলেন। রামকৃষ্ণ আবার কহিলেন, “তুমিই কি জ্ঞানী ?” মাষ্টার ভাবিতেছেন এত লেখা পড়া করিয়া যে কত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কি জ্ঞান নহে ? মহা সন্দেহ

উপস্থিত হইল, রামকৃষ্ণের কথায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে জ্ঞান জ্ঞান নহে। যাহা হউক রামকৃষ্ণদেব মাষ্টার মহাশয়কে অনেক ঈশ্বরীয় কথা বলিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন।

একদিন যোড়াসাঁকোস্থ একটি হরিসভায় রামকৃষ্ণদেব ভাগবৎ পাঠ শুনিতে গমন করিলেন। রামদয়াল চক্রবর্ত্তীও তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনি বাগবাজার বসুপাড়ায় বলরাম বসুর বাটীতে বাস করেন এবং বহুদিন ধরিয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিতেছেন। ইনিই পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া কটক হইতে বসুজ মহাশয়কে কলিকাতায় আনয়ন করেন ও পরদিন সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট গমন করেন। রামদয়াল দেখিলেন—পণ্ডিতেরা ভাগবৎ পাঠ করিতেছেন, শ্রোতাগণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন। সভামধ্যে কয়েকজন ভক্ত রামকৃষ্ণদেবকে ঘেরিয়া বসিয়া কখন ঐ পাঠ শুনিতেছেন এবং কখন বা রামকৃষ্ণদেব মৃদুস্বরে যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতেছেন। রামদয়াল ঐ দলের নিকটে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে ভাগবৎ পাঠ শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার দুই একটী কথাও শ্রবণগোচর হইল। শুনিলেন, পণ্ডিতেরা, শ্রীভাগবৎ পাঠ করিয়া যে সমস্ত কথাগুলি তদ্দণ্ডে বলিতেছিলেন, কিন্তু বিশদরূপে বুঝাইতে পারিতেছিলেন না, রামকৃষ্ণদেব সেই সমস্ত কথার নিগূঢ় তত্ত্বই দুই চারি কথায় অতি সহজে বলিতেছেন! রামদয়াল ভাগবৎ পাঠের সময় রামকৃষ্ণদেবকে পাঠ শ্রবণ না করিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অপরের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন ভাগবৎ পাঠক যাহা বলিতেছেন সেই সকল কথার গূঢ় তত্ত্বই তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন বৈরাগ্যভক্তি বিশিষ্ট জীবন ও খালি পাণ্ডিত্যে কতই

প্রভেদ! শ্রীভগবানের কথার মর্ম্ম বুঝা খালি ব্যাকরণের কর্ম্ম নয়। অতঃপর রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল।

রামকৃষ্ণদেবকে জনৈক ভক্ত এই সভাতেই প্রথম দর্শন করেন। ইহার পূর্ব্বে একদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট শুনিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তাঁহার মহাপ্রভুর মত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাব হয়; ভগবানের কথা কহিতে কহিতে তিনি সমাধিস্থ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এক দিন তাঁকে দেখ্‌তে যাবি?"

ভক্ত বলিয়াছিলেন, "যাব।" ঐ ভক্তটীর সহপাঠী রাখালের সঙ্গে বড়ই প্রণয় ছিল এবং তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে রাখাল মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যান। পরদিন বিদ্যালয়ে গিয়া রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই, দক্ষিণেশ্বরে নাকি একজন সাধু আছেন?"

রাখাল বলিলেন, "আছেন। তুমি তাঁকে দেখতে যাবে?"

ভক্ত। "যাব। তুমি তাঁকে দেখেছ? কেমন লোক?

রাখাল। "হ্যাঁ দেখেছি। একদিন গিয়ে দেখে এস না।"

ভক্ত। "আচ্ছা, কাল কি তিনিই যোড়াসাঁকো পালেদের বাড়ী ভাগবৎ শুনতে এসেছেলেন?"

রাখাল। "তা হতে পারে। যেখানে ভগবৎ চর্চ্চা হয়, তিনি সেইখানেই যান। আস্‌ছে শনিবারে তাঁর কাছে যাবে?"

ভক্ত সম্মত হইলেন, দুই জনে একত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবেন স্থির করিলেন। শনিবারে বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে দুইজনে একত্রে আহিরীটোলার ঘাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথা হইতে নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিবেন, এই বাসনা। পথে যাইতে যাইতে রাখাল কহিলেন, "আজ সেখানে থাকবে? সহপাঠী মনে

করিলেন, "যাচ্ছি সাধু মানুষের কাছে, হয়ত একটী কুঁড়ে ঘরে থাকেন ;" তাই জিজ্ঞাসিলেন, "থাকবার জায়গা হবে ত ?"

রাখাল কহিলেন, "তা, হতে পারে।"

ভক্ত ভাবিলেন, কলিকাতা হইতে একটু দূরে গমন করিতেছেন সুতরাং রাত্রে প্রত্যাগমন অসম্ভব হইতেও পারে, কিন্তু সাধু ভিক্ষা করিয়া আহার করেন—তিনি কি আহার করিবেন ? এই ভাবিয়া রাখালকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হে, সেখানে কি খাওয়া যাবে ? দোকান টোকান আছে ত ?"

রাখাল অন্তরে হাসিয়া বলিলেন, "তা যা হয় এক রকম হবে এখন।"

আহিরীটোলার কাছাকাছি আসিয়া তাঁহাদের রামদয়াল চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও সেই দিন রামকৃষ্ণদেবের জন্য নানাবিধ উত্তম ভোজ্যদ্রব্য লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেছেন। তিনজনে এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্ত দেখিলেন, সুন্দর বাঁধা ঘাট, তাহার দুই পার্শ্বে ফুলের বাগানে বসন্তের নানাবিধ সুগন্ধি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; সম্মুখে সারি সারি দেবালয়, উত্তরে প্রকাণ্ড উদ্যান ও অট্টালিকা—কুটীর নহে। তিন জনে রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠে গিয়া দেখিলেন, তথায় কেহই নাই। "তিনি কালীমন্দিরে গেছেন, আমি তাঁকে ডেকে আনি, আপনারা এখানে বসুন," এই বলিয়া রাখাল দ্রুতপদে কালী-মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। কিছু পরেই রাখাল তাঁহাকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব ভাবে বিভোর, ঘোর মাতালের মত টলিতে টলিতে আসিতেছেন, রাখাল তাই তাঁহাকে ধরিয়া 'এখান উঁচু, এখান নীচু' বলিয়া সাবধানে আনিতেছেন।

ক্রমে ঘরে আসিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ছোট খাটটীর উপর বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে সহজ অবস্থা হইলে নবাগত ভক্তকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামদয়াল তাঁহার পরিচয় দিলেন। রামকৃষ্ণদেব পরিচয় পাইয়া প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, "বটে, অমুকের কুটুম্ব, তবে ত আমাদেরও কুটুম্ব। তা বেশ বেশ; তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

ভক্ত। "আজ্ঞে, তড়া আঁটপুর।"

রামকৃষ্ণদেব। "বটে? তবে ত তোমাদের দেশেও একবার গেছি। আচ্ছা ঝামাপুকুরের কালী ভুলুর বাড়ীও সেইখানে না?"

ভক্ত। "হঁ্যা, আপনি তাঁদের কেমন কোরে জান্‌লেন?"

রামকৃষ্ণদেব। "তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ী আর ওদের বাড়ী যখন তখন যেতুম।" এই কথা বলিয়া ভক্তের হস্ত ধরিয়া, "এস, আলোয় এস, তোমার মুখখানি দেখি" বলিয়া রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লইয়া—একটু দূরে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিতেছিল—তাহার নিকট গেলেন। দীপালোকে মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন 'হুঁ হুঁ,' তৎপরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন! পরে "আচ্ছা, তোমার হাত দেখি," বলিয়া তাঁহার হাত খানি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহা আপন হস্তের উপর রাখিয়া তাহার ভার অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্ল বদনে আবার বলিতে লাগিলেন, "হুঁ, হুঁ, তা বেশ বেশ।" এইবার ভক্তকে ছাড়িয়া রামদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন কেমন আছে জান? শুনেছিলুম তার একটু অসুখ কোরেছিল।"

রামদয়াল। "তিনি ভাল আছেন, শুনেছি।"

রামকৃষ্ণদেব। "দেখ, সে অনেকদিন আসেনি। তাকে দেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে, একবার তাকে এখানে আসতে বোল, মনে থাকবে ত ?"

রামদয়াল। "আজ্ঞে অবিশ্যি মনে থাকবে, বোলবো, ভুলব না।"

কথায় বার্ত্তায় প্রায় দশটা বাজিল। রামদয়াল যে সমস্ত ভোজ্য রামকৃষ্ণদেবের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তৎসমুদয় রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের তিনজনকেই ভোজন করাইলেন। ভোজন শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোথায় শোবে, ঘরের ভেতর না বারাণ্ডায় ?"

রাখাল বলিলেন, "আমি ঘরে শোব।"

রামদয়াল। "মশাই, আমি বাইরে বারাণ্ডায় শোব।"

ভক্তও কহিলেন, "আমিও বাইরে শোব।"

রামকৃষ্ণদেব। "বারাণ্ডায় শুলে কষ্ট হবে যে।"

ভক্ত। "আজ্ঞে না, কোন কষ্ট হবে না।" ভক্ত ভাবিলেন, সাধু মানুষ, রাত্রে হয়ত সাধন ভজন করেন। ঘরে ভিতর শয়ন করিলে হয়ত তাঁহার সাধনায় কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে। রামকৃষ্ণদেব পুনরায় কহিলেন, "দেখ, তোমরাও ঘরে শোও, বারাণ্ডায় কষ্ট হতে পারে।" তাঁহারা পুনরায় অস্বীকার করায় রাখাল ঘরের মধ্যেই শয়ন করিলেন এবং ভক্তটী রামদয়ালের সঙ্গে পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় শয়ন করিলেন। চৈত্রমাস, শীততো নাইই, সেদিন তেমন গ্রীষ্মও ছিল না, একটু তন্দ্রা আসিতেছে, এমন সময় বাগানের চৌকিদারেরা হাঁক দিল। এক দিক হইতে হাঁকিল, এ হৈ-ই-ই-ই ; অমনি আর এক জন অপর দিক হইতে উত্তর করিল এ হৈ-ই-ই-ই। বিকট চীৎকারে ভক্তের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। শয়নের পর প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হইয়াছে,

রামকৃষ্ণদেব শয্যা ত্যাগ করিলেন, পরিধেয় বস্ত্রখানি বগলে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া রামদয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা, ঘুমুলে ?"

রামদয়াল। "আজ্ঞে না।"

রামকৃষ্ণদেব অতীব ব্যগ্রতার স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তাকে একবার আসতে বোল। তার জন্যে আমার বুকের ভেতরটা (বগল হইতে কাপড় লইয়া মোড়া দিয়া) এই রকম মোড়া দিচ্ছে, যেন কাপড় নিংড়ুচ্ছে। তুমি একবার তাকে আসতে বোল।" তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাঁহার অন্তরের কাতরতা, প্রত্যেক মুখভঙ্গীতে নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের প্রগাঢ় আকর্ষণ, অভিব্যক্ত হইতে লাগিল।

রামদয়াল। "আজ্ঞে আমি কালই তাঁর সঙ্গে দেখা কোরে বোলবো আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বোলব যে, তিনি আপনার জন্যে অস্থির হয়েছেন, একবার গিয়ে দেখা কোরে আসুন।"

রামকৃষ্ণদেব। "হ্যাঁ! তার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়ছে—একটীবার দেখা করে যেতে বল।"

রামদয়াল। "আমি রাতটা পোহালেই তাঁর কাছে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না, তিনি ভাল আছেন। আর আপনি অস্থির হয়েছেন শুনলেই তিনি তখনই আসবেন।"

ভক্ত ভাবিতেছেন—"এ কি ভালবাসা, এত অস্থির! এঁর এত ভালবাসা আর সে লোকটা কেমন ? একবার আসে না!"

রামকৃষ্ণদেব পশ্চাৎ ফিরিয়া আপনার ঘরের দিকে গমন করিলেন। কয়েক পদ যাইয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তবে বোল, একবার তাকে আস্‌তে বোল" এইরূপে ঐ কথা বার বার বলিয়া টলিতে টলিতে ঘরে গিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। প্রায়

এক ঘণ্টা পরে আবার শয্যাত্যাগ করিয়া কাপড় বগলে লইয়া যেন দশ বোতল মদ খাইয়া মাতালের মত উন্মত্তভাবে টলমল করিতে করিতে রামদয়ালের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ উন্মাদের ন্যায় সেই একই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, নরেন বড় শুদ্ধ সত্ত্ব, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাকে না দেখলে থাকতে পারিনি। বুকের ভেতরটা যেন কাপড় মোড়া দেয়, এমনি কোরে মোড়া দিচ্ছে।" নিজ হস্তে কাপড়খানি মোড়া দিয়া দেখাইতে লাগিলেন আর মহা কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। সে এক-বার যেন আসে।" তিনি সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এইরূপ করিলেন।

নিশাবসান হইল। নবাগত ভক্তটি প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রাত্রের ন্যায় ভাব এখন আর নাই। যেন সে লোকই নন্। রামকৃষ্ণদেব ভক্তকে পঞ্চবটীর উত্তরের জঙ্গলে শৌচে গমন করিতে ও পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে কহিলেন।

ভক্তের বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর, কিন্তু দেখিলে মনে হয়, পনর ষোলর অধিক নহে, অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ। অতি শৈশবাবস্থায় যদি কেহ তাঁহাকে আদর করিয়া বলিত, "তোর বিয়ে হবে," তবে তিনি কাঁদিয়া অস্থির হইতেন, আর আধ আধ কথায় বলিতেন, "আমি মোয়ে যাব, আমি মোয়ে যাব।" যখন তাঁহার বয়ক্রম মাত্র আট বৎসর, তাঁহার মনে হইত, "বেশ একজন সাধু সঙ্গী পাই ত গঙ্গার ধারে গাছপালার মধ্যে নির্জ্জনে একটি কুঁড়ে ঘরে সাধু হয়ে থাকি, সন্নিসি হই।" যখনি এই কথা ভাবিতেন তখনই এই ভাবের একটী ছবি তাঁহার মনে উদয় হইত। পঞ্চবটীর কাছে যাইয়া তাহার নিকট কুটীরখানি ও তাহার চতুর্দ্দিকের স্থান দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। কি আশ্চর্য্য, বাল্যে যখন সাধু হইবেন মনে করিয়াছিলেন, তখন এই

স্থানটীর ছবিই কি মনোমধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন! কি আশ্চর্য্য, একেবারে ঠিক সেই স্থান! যাহা হউক মনোভাব গোপন করিয়া শৌচাদি ক্রিয়ান্তে আবার রামকৃষ্ণদেবের নিকট আগমন করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেমন পঞ্চবটী দেখলে, বল?" ভক্ত অন্তরের কথা চাপিয়া কেবল কহিলেন, "বেশ মশাই।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "এইবার যাও, মাকে দর্শন কোরে এস, মার ঘরে যাও।" ভক্ত কালীদর্শন করিয়া, রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে রামকৃষ্ণদেব কহিলেন "আবার আসবে ত?" ভক্ত বলিলেন "আজ্ঞে হাঁ, আসব।" রাখাল সেই খানেই রহিলেন, ভক্ত চলিয়া গেলেন।

রামদয়াল যাইয়া নরেন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। ভক্ত চলিয়া গেলেন কিন্তু সাধুটীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "লোকটী বড় ভাল, নরেনকে কতই ভাল বাসেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সে লোকটা কেমন, একবার আসে না।" পর রবিবারে তিনি আবার রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত। বেলা আটটা, দেখিলেন সেখানে আরও দুই চারি জন লোক রহিয়াছেন। শুনিলেন, নরেন আসিয়াছে রাখাল আসিয়াছেন, ভবনাথ হরিশ ও লাটু প্রভৃতি উপস্থিত আছেন। পঞ্চবটীতে আজ রামকৃষ্ণদেবের বালক ভক্তবৃন্দ স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিবেন সকলের বড়ই আনন্দ। ভক্তকে দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি এসেছ? বেশ হয়েছে, যাও, পঞ্চবটীতে আজ ওরা সকলে চড়িভাতি করবে। নরেন এসেছে তার সঙ্গে আলাপ করগে।"

ভক্ত পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলে, রাখাল সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। নরেনকে দেখিয়া ভক্ত বিস্মিত—কি চক্ষুদ্বয়

যেন তাহা হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কি মুখশ্রী, দেখিলেই যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। নরেন কথায় কথায় হাসিতেছেন—ভক্ত মনে করিলেন, এমন হাসি তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখেন নাই। নরেন পঞ্চবটীতে সদ্দার পাচকের মত রন্ধনের বিষয় বলিয়া দিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে গল্প করিতেছেন। এবার নরেন একটি গান ধরিলেন। সে মধুর স্বরলহরী পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যেন ছাইয়া ফেলিল। ভক্ত অবাক হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইলেন এবং ভাবিলেন, "এঁর এত গুণ!"

এইরূপে সেদিন মহানন্দে কাটিয়া গেল এবং রামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ভক্তগণকে তাঁহার বড়ই মিষ্ট বোধ হইল।

বলরাম বসু প্রায় প্রত্যহই আসেন—যখনই সুবিধা পান, তখনই আসেন। রামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়ের কথাতেই সমান উৎসাহ; কালী, কৃষ্ণ, রাধা, শিব, গৌরাঙ্গ, যীশু প্রভৃতি সকল দেবদেবী, সকল অবতারের সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতেই তাঁহার প্রেমে অশ্রুপাত ও ভাবাবেশ হয়, আবার নির্গুণ ব্রহ্মের চর্চ্চাতেও সমাধিস্থ হইয়া যান—ইহাই দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর বলরাম অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ভাবেন, "এঁর মূল ভাবটী কি?" কিন্তু কিছুই কূলকিনারা করিতে পারেন না! "আচ্ছা, এঁর কোন ভাবটীর কখনও পরিবর্ত্তন হয় না? বোধ হয় অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ, এইটী।" একদিন প্রাতঃকালে পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতেছেন আর এইরূপ ভাবিতেছেন—"কয় বৎসর দিন রাত যাওয়া আসা করছি, কিন্তু কৈ হিংসা তো এঁর কারো প্রতি কখন দেখি নি। আমার চিরকাল অহিংসাটাই বড় ধর্ম্ম বলে মনে হ'তো, কিন্তু এঁর কাছে এসে সেটা যেন উল্টে গেছে। এখন মনে হয়

ভক্তিটাই বড়। যদি ভগবৎ পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, এমন লোক একটু আধটু মাছ খায় বা ছারপোকা মাকড়সাটা মারে; তাকে আর ঘৃণা হয় না, তার পদধূলি নিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তিলাভ না করে খালি অহিংসা পালন কল্লে অহঙ্কারই বাড়ে; যা হোক ঠাকুরের কিন্তু অহিংসা পালনটা সর্ব্বদা দেখছি।" এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই দেখেন, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে ছারপোকা মারিতেছেন! বলরাম স্তম্ভিত; ভাবিলেন, "একি, এ ত কখন দেখি নি! বাবা! ভাগ্যে এই ছারপোকা মারা কিছুদিন আগে দেখি নি, তা হ'লে ত এঁর ভাব সমাধি কিছুই গ্রাহ্য করতুম না। ঐ ছারপোকা মেরেছেন বলে পালাতুম, আর ওঁর দিক্ মাড়াতুম্ না। বোধ হয় আমার মনের ভাব ঐরূপ ছেল বলেই আমার ভাব নষ্ট হ'য়ে অকল্যাণ হবে, তাই আমায় ওঁর এভাব দেখান নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কয় বৎসরের একটী দিনও উহা চক্ষে পড়ে নি!" বলরাম এইরূপ নিজ ধর্ম্মজীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতবার যত রকম নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন রামকৃষ্ণদেবকেও সেই মতাবলম্বী দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেন ও ভাবিতেন, "এরি নিকট শুনেছি, ভগবানের ভাবের 'ইতি' হয় না, এঁরও তাই।

কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা, দেবেন্দ্রনাথ, দেখিতে খর্ব্বাকার, গৌরবর্ণ ও শান্তপ্রকৃতি, কোন জমিদারের সরকারে কর্ম্ম করেন ও কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাটীতে থাকেন। "ভগবান আছেন কি না?"—মধ্যে মধ্যে ইঁহার মনে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কত লোককে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কাহারও কথায় কোন প্রকার প্রত্যয় জন্মে না। ইনি এখন কয়েক দিন যাবৎ

ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছেন, এজন্য কর্ম্মস্থলে যাইতে হয় না, অথচ বাটীতে বসিয়া বসিয়াও সময় কাটে না; সম্মুখে সাধু অঘোরনাথের এক খানি জীবনচরিত পড়িয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পুস্তকখানি পড়িতে এতই ভাল লাগিল যে শেষ না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। অঘোরনাথ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দলভুক্ত একজন ব্রাহ্ম প্রচারক। কোন সময়ে ইনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোন এক স্থানে প্রচার কার্য্যের জন্য যাইতেছিলেন। গন্তব্যস্থান রেলপথ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, এজন্য এক্কা করিয়া রজনী যোগে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, দূরে আলোক লইয়া জন কতক লোক ঢোল বাজাইয়া গান করিতেছে। ঐ স্থান ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই পশ্চাৎ হইতে জন কয়েক লোক আসিয়া এক্কার গাড়োয়ানকে বলিল "ঠ্যারো" (দাঁড়া)! এক্কা-ওয়ালা ভীত হইয়া এক্কা থামাইল, লোকগুলি আসিয়া অঘোরনাথের নিকট যাহা কিছু আছে বাহির করিয়া দিতে বলিল, এবং দলের একজন অন্য লোকদের একটী ইঙ্গিত করিল। অঘোরনাথ তাঁহার প্রাণবধের ইসারা হইয়াছে স্থির বুঝিয়া তাহাদের কহিলেন, "বাবা আমাকে মার তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমরা অনুগ্রহ করে একটু সময় দেও, আমি ভগবানকে ডেকে নিই।" দস্যুরা সম্মতি দিল। অঘোরনাথ এক্কা হইতে নামিয়া নিকটে উপবিষ্ট হইয়া একটু ধ্যান করিলেন, পরে একটী ভজন গাহিতে লাগিলেন। প্রাণ যাইবে এই জ্ঞানে সকাতরে বিশ্বনাথকে স্মরণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া দস্যুরা বলাবলি করিতে লাগিল, "এ ভেইয়া, ইস্‌কো মৎ মারো, ইয়ে তো ফকির হ্যায়।" দস্যুরা অঘোরনাথকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পুস্তকের ঐ স্থানটী পড়িয়াই দেবেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে

বলে ভগবান নেই, এই যে ভগবান আছেন দেখছি, নইলে অঘোর-নাথকে কে বাঁচালে ?" দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ভগবান লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইবেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। একদিন হঠাৎ মনে ফুট উঠিল, "গুরু বিনা গতি নাই।" আবার মনে হইল, "যে সে গুরু হইলে তো চলিবে না; খাঁটী গুরু চাই।" গুরুর জন্য ভগবানের নিকট কতই প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্ম গ্রন্থাদি পড়িয়া একটু ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, সুতরাং মহাত্মা কেশবের ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কেশবের বক্তৃতা বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল, কিন্তু সদ্‌গুরু লাভের পিপাসা এখানেও মিটিল না।

ভগবান লাভের জন্য মন যতই ব্যাকুল হইতে লাগিল, বিষয়ী লোকের সমাগম ততই বিষবৎ মনে হইল, তাই পূর্ব্বের বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া পাথুরিয়াঘাটায় জনৈক আত্মীয়ের নিকট একটী নির্জ্জন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রতা যতই বাড়িতে লাগিল অশান্তিও ততই বাড়িতে লাগিল। "যদি ভগবান থাকেন ত কেন তাঁর দর্শন পাই না" এই প্রকার চিন্তায় হয়ত সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যায়। একদিন এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে ভাবিলেন, কালনায় যাইয়া ভগবান দাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন; "ভগবান জানা লোক নইলে আমায় ভগবান কেমন কোরে দর্শন করাবেন?" এই ভাবিয়া তখনই কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া আহিরীটোলার ঘাটে আসিলেন। দেখিলেন জাহাজ চলিয়া গিয়াছে! মহা বিষাদে মগ্ন হইলেন। ম্রিয়মাণ হইয়া আবাসে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া, নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। মন অত্যন্ত অস্থির, কি করেন কিছুই স্থির করিতে

পারিতেছেন না। সম্মুখে একখানি পুস্তক পড়িয়াছিল, অন্যমনস্ক হইয়াই তাহা খুলিলেন। যে পৃষ্ঠাটী খুলিলেন তাহার তলদেশে টীকা হিসাবে লেখা, "দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও এই মত।" পড়িয়াই ভাবিতে লাগিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস! পরমহংস তো যার ভগবান লাভ হয়েছে তাকে বলে। সে যে অতি উচ্চ অবস্থা, তবে কি ইনি আমার অভীষ্ট লাভে সহায় হইবেন? কোন্ মতের সমর্থনে ঐ নাম পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আর পড়িবার বাসনা হইল না। পুস্তকখানি মুড়িয়া দেখিলেন, উহার নাম, "ভক্তি চৈতন্য চন্দ্রিকা"। দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "যাই, ইঁহাকেই দেখে আসি।" অমনি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং বাটীর একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে রাসমনির ঠাকুরবাড়ী কোথা জান?" ভৃত্য ঠিকানা ও তথায় কি প্রকারে যাইতে হয় বলিয়া দিল। দেবেন্দ্র আপন আবাসে যাইয়া একটী টাকা ও চারি আনা পয়সা লইয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের বহির্ভাগে বামদিকে একটী পিতলের জলপূর্ণ কুম্ভ! দেবেন্দ্রের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দ্রুতপদে আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া একখানি পান্‌সিতে উঠিলেন। মাঝিকে বলিলেন, "বাপু, আমায় রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে নামিয়ে দিও।" গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণে বাতাস, আবার গঙ্গায় জোয়ার, নৌকা তীরবেগে ছুটিল। কিয়দ্দূর যাইয়া ঘুস্‌ড়ির ট্যাঁকের নিকট মাঝি কহিল, "মশাই, ঐ রাসমণির ঠাকুরবাড়ী দেখা যাচ্ছে।" দেবেন্দ্রের হৃদয়ে নানা তোলাপাড়া হইতে লাগিল; একবার মনে হইল, "এই পথটুকু শীঘ্র শীঘ্র যেতে পাল্লে হয়," আবার ভাবিলেন, না, নৌকাখানা একটু দেরীতে পৌঁছাইলেই ভাল। ভাবিতে লাগিলেন, সাধুকে যাইয়া কি বলি-

বেন। কখন পরমহংস সাধু দর্শন করেন নাই, সে জন্য দেবেন্দ্রনাথ সাধুকে যাইয়া কি বলিবেন, এই ভাবিয়া চিন্তান্বিত হইলেন, অন্য সময়ে কত তর্ক যুক্তি হৃদয়ে উঠে কিন্তু এ সময়ে হৃদয় যেন শূন্য, তর্ক যুক্তির কিছুই ভিতরে খুঁজিয়া পাইলেন না! এই বারে নৌকা রাসমণির দেবালয়ের ঘাটে লাগিবে। দেবেন্দ্র উঁকি মারিয়া দেবালয়ের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন অতি সুরম্য স্থান, ঘাটের উপরেই ফুল বাগান। বাগানে একজন লোক দণ্ডায়-মান, তাঁহার গলদেশ হইতে একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা একটী হস্ত বাঁধা, যেন হাতে কোন আঘাত লাগায় হাতটীকে ঐ ভাবে রাখা হইয়াছে।

নৌকা লাগিল, দেবেন্দ্র কূলে উঠিতে উঠিতে দেখিলেন, জলে একজন (পরে জানিলেন উঁহার নাম নিরঞ্জন) স্নান করিতেছেন ও একজন সুন্দর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে কাপড় বগলে করিয়া করজোড়ে স্তব পাঠ করিতে করিতে ঘাটের সিঁড়িতে উঠিতেছেন। দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসিলেন, "মশাই, রামকৃষ্ণ পরমহংস কোথায় থাকেন?" ব্রাহ্মণ অতি সুমিষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "ঐ যে বাবা, তিনি ঐ ঘরে থাকেন, ঐ গোল বারাণ্ডাওয়ালা ঘর, ঐ খানে যাও।" দেবেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে সেই বারাণ্ডায় বসিয়া থাকিলেন। মুহূর্ত্তেক পরে ফট্ ফট্ শব্দে চটি জুতা পরিয়া একজন লোক, কোঁচার কাপড়টী স্কন্ধে ফেলা, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই স্থির করিলেন, "ইনিই সেই পরমহংস।" ভাবিয়াছিলেন, জটাজূটধারী, গেরুয়া-পরা, চিম্‌টেহস্তে সাধু দেখিবেন; কিন্তু রামকৃষ্ণদেবকে দর্শনমাত্র তাঁহার ওসমস্ত চিন্তা কোথায় চলিয়া গেল; ভাবিলেন, ইনিই সেই পরমহংস। দেবেন্দ্র নাথ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ দিক দিয়ে ঘরের ভিতর এস।" দেবেন্দ্র নাথ উত্তর দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিলেন, রামকৃষ্ণদেব ঘরের ভিতর দিয়া অপর দিকে চলিলেন। দেবেন্দ্র নাথ উত্তর দিকে যাইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব উত্তরের দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। দেবেন্দ্র একটু দূরে জুতা ছাড়িয়া আসিতেছিলেন দেখিয়া রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "ঐ খানকে রেখনি, জুতা চুরি যাবেক, এই খানকে রাখ," দেবেন্দ্র জুতা রাখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কোথা থেকে আসা হয়েছে?"

দেবেন্দ্র কহিলেন, "কোলকেতা থেকে।"

রামকৃষ্ণদেব নিজ হস্তে বংশীধারীর ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, "কি, এমনি এমনি ঠাকুর দেখ্‌তে এসেছ?" অর্থাৎ দেবালয়ে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দেখ্‌তে এসেছ?

দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে না আমি আপনাকেই দেখিতে এসেছি।" রামকৃষ্ণদেব বালকের মত কাতর ভাবে কহিলেন, "আর বাপু! আমাকে আর কি দেখবেক্, এই দেখ আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। বড়ই যন্ত্রণা হচ্ছে।" এই বলিয়া দেবেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হাতটীর উপর দিলেন ও বলিলেন, "দেখ দেখি হাড় ভেঙ্গেছে কি না, বড় যন্ত্রণা, কি করি?" দেবেন্দ্র অগত্যা একটু টিপিয়া দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কোরে ভেঙ্গেছে?"

রামকৃষ্ণদেব কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিলেন, "একটা অবস্থা হয়, সেই সময়ে ভেঙ্গেছে," অর্থাৎ ভাবের অবস্থায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "আবার ওষুধ দিলে বাড়ে, অধর সেন আরোক পাঠিয়ে দিছিল। তা দিয়ে আরো ফুলে গেল, তাই আর কিছু দিইনি। হ্যাঁগা, ভাল হবে ত?"

দেবেন্দ্র ভাবিলেন "সাধু মানুষ, এঁদের আপনা আপনিই ভাল হয়ে যাবে।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "ভাল হবে বই কি, ভাল হয়ে যাবে।"

এই কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণদেব বালকের ন্যায় আনন্দে আটখানা হইয়া সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ ইনি কোলকেতা থেকে এসেছেন, ইনি বল্‌ছেন, হাত ভাল হয়ে যাবে।"

অধরচন্দ্র সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আহিরীটোলায় বাড়ী, সেজন্য দেবেন্দ্র নাথের ঐ নাম অবিদিত ছিল না। অধর চন্দ্রের নাম শুনিয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, "বটে, তবে বড় বড় লোকও এখানে আসে, দেখ্‌ছি।" দেবেন্দ্র দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবের দেহ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল, আর তাঁহার অন্তরটী বালকের মত সরল। দেবেন্দ্রের চক্ষে রামকৃষ্ণদেব যেন স্ত্রীলোকের দেহে বালকের মন—এইরূপ এক অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! ভাবিলেন, "ইনি যেন আমায় বাক্‌-সিদ্ধ পেলেন; আমি বোলেছি বোলেই হাত আরাম হয়ে যাবে এঁর বিশ্বাস! এত সরল বিশ্বাস মানুষে হতে পারে!" আবার মনে হইল, "হয়ত এ সমস্ত লোক দেখান ঢঙ্‌।" ঐরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি রামকৃষ্ণদেবের দিকে অনেকবার তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সরল বালকের মত অমায়িক ব্যবহারের সম্মুখে সমস্ত সন্দেহ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কথায় কথায় রামকৃষ্ণদেব 'ভগবৎ-প্রেম কি' তাহা দেবেন্দ্র ও উপস্থিত আর দুই এক জন ভক্তকে বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন, "দেখ, প্রেম কারে বলে জান? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আপনাকে ভুল হয়ে যাবে, ঝড় উঠ্‌লে যেমন গাছ পালা আর চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎ-প্রেমের উদয় হলে সব ভেদ-

বুদ্ধি চলে যায়।" এই কথা বলিয়া হরিশকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এঁকে কিছু জল খাবার দে।" হরিশের ভাব দেখিয়া দেবেন্দ্র বিস্মিত! হরিশের মুখে কথা নাই; যেন প্রাণ মন এক করিয়া রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছেন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন, আর রামকৃষ্ণদেব যখনি যে কার্য্য করিতে বলিতেছেন, কলের পুতুলের মত তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে সম্পন্ন করিতেছেন! হরিশ প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্রে এক হস্তে একটী সন্দেশ অপর হস্তে একটী পাত্রে জল আনিয়া দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; মুখে কিন্তু কোন কথাই বলেন না। দেবেন্দ্র মুস্কিলে পড়িলেন, বিনা আহ্বানে কেমন করিয়া উহা হরিশের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন! সেটা সামাজিক ও শিষ্টাচার নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে সংস্কার আছে। হরিশ কিন্তু সন্দেশ ও জলের গেলাস হস্তে পূর্ব্ববৎ স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান! অগত্যা দেবেন্দ্রই হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাই এ কি আমার জন্যে এনেছেন?" হরিশ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক থাকিয়া প্রশ্নের উত্তরে কেবলমাত্র হস্তদ্বয় দেবেন্দ্রের দিকে আরও একটু অগ্রসর করিলেন। দেবেন্দ্র আর কি করেন, হরিশের হাত হইতে উহা লইয়া জলযোগ করিলেন। তৎপরে পুনরায় রামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যালাপ শুনিতে লাগিলেন! তাঁহার কথাগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোন বিষয়ে তর্ক যুক্তি করিবার দেবেন্দ্রের স্পৃহাও হইল না। রামকৃষ্ণদেবের নিকট অবস্থানই মহা শান্তিপ্রদ বোধ করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রের রামকৃষ্ণদেবকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে বড়ই ভাল লাগিতে লাগিল। মনে হইল, এমন কথা আর কখনও শুনেন নাই। সে কথা ভুলিবার যো নাই. এবং তাহার

মর্ম্ম বুঝিতেও বিলম্ব হয় না। বিশ্বাস না হইলেও সে কথা প্রাণে বাজিতে থাকে। আর রামকৃষ্ণদেবের চেহারায় কি একটী অনির্ব্বচনীয়ত্ব রহিয়াছে! উহা তাঁহার সৌন্দর্য্যে নাই, গঠনে নাই, মন ভুলান গৌরবর্ণে নাই; তথাপি সেটুকু এ সমস্ত অপেক্ষা বেশী আকর্ষক—ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতে হয়।

কতকক্ষণ এইরূপে কাটিলে, রামকৃষ্ণদেব কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ, এখানে অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণে খায়। ঠাকুর বাড়ী, ঠাকুরের প্রসাদ খাবার আপত্তি কিছু নেই। তুমি এখানে খাও; বেলা হয়েছে, এখন আর যেও না।" এই বলিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে এঁকে বিষ্ণু-ঘরের প্রসাদ দিস্।" শুনিয়া দেবেন্দ্র ভাবিলেন, তিনি যে নিরামিষাশী, রামকৃষ্ণদেব সে কথা কেমন করিয়া জানিলেন? ইনি কি অন্তরের কথাও জানিতে পারেন?

দেবেন্দ্র সে দিন আর স্নান করিলেন না; রামলালের সহিত আহার করিতে গেলেন। আহার করিতে বসিয়া রামলালের সহিত রামকৃষ্ণদেবেরই কথা কহিতে লাগিলেন। আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য উত্তরের বারাণ্ডায় শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রের মনে সেদিন আর কোন চিন্তাই স্থান পাইল না, তিনি রামলালের নিকট রামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সংবাদ লইতে লাগিলেন। তিনি যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বপ্ন-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

একটু বিশ্রামের পর আবার রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ বোধ হয়েছে, এ রকম দেখ্‌ছি কেন?"

দেবেন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গিল। সত্য সত্যই তিনি অসুস্থ হইয়া-

ছেন, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় তিন মাস কাল আর ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত হন নাই, অদ্য কিন্তু আবার সেই জ্বর হইয়াছে, পাঁজরাটায় একটা বেদনা ধরিতেছে। দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু জ্বর হয়েছে—মনে হচ্চে।"

শুনিয়া, রামকৃষ্ণদেবের মুখমণ্ডলে সদা-বিরাজমান আনন্দের ভাব একেবারে অন্তর্হিত হইল, তিনি অতীব ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যাঁ, তোমার কি জ্বর হয় না কি ?"

দেবেন্দ্র। "আজ্ঞে, আগে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি। তিন মাস হ'ল জ্বর হয়নি, ভাল ছিলুম। আজ আবার সেই জ্বর হয়েছে।"

রামকৃষ্ণদেবের মুখমণ্ডলে চিন্তার তরঙ্গ আরও ফুটিয়া উঠিল। তিনি "তাইত, তাইত" বলিয়া ঘরের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন; যেন কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব কথিত 'ভক্ত' * আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "***এসেছিস্, বেশ হয়েছে; দেখ্, ইনি কোলকেতা থেকে এসেছেন, বড় ভাল লোক। এঁর জ্বর হয়েছে, বাড়ী যাবেন! তা একলা কেমন কোরে যাবেন; তুই এঁকে (অতি ব্যগ্রতাব্যঞ্জক স্বরে) একখানা নৌক কোরে এঁর বাড়ী পৌঁছে দে।" প্রভুর আজ্ঞা ভক্তের শিরোধার্য্য। ভক্ত কত আশা করিয়া আসিয়াছেন—প্রভুর সঙ্গে কথা কহিয়া, প্রভুর পদ সেবা করিয়া—পরিতৃপ্ত হইবেন। এখন প্রভুর আজ্ঞা অন্যরূপ হইলেও, সানন্দ-চিত্তে তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ

* ইনি রামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ আহূত ভক্ত, সন্ন্যাসী। ইঁহার আজ্ঞামত নামোল্লেখ করা হইল না। 'ভক্ত' বলিলেই, পাঠক, ইঁহাকেই জানিবেন।

গঙ্গার তীরে নৌকার চেষ্টায় দণ্ডায়মান হইলেন ; রামকৃষ্ণদেবও পশ্চিমের দ্বার খুলিয়া, দ্বারে দাঁড়াইয়া, নৌকা দেখিতে লাগিলেন। পান্সি দৃষ্টিগোচর হইল না। রামকৃষ্ণদেব দূরে একখানি বাঙাল মাঝীর টাপুরে নৌকা দেখিতে পাইয়া ভক্তকে ঐ নৌকা ডাকিতে কহিলেন। ভক্ত চীৎকার করিয়াও উত্তরীয় নাড়িয়া, মাঝিকে ইঙ্গিত করিলে, মাঝি নৌকা ফিরাইয়া ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল। ভক্ত দেবেন্দ্রকে লইতে ঘরের ভিতর আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব মধুর হাস্যবদনে ভক্তের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "দেখ্, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে, তুই আজ যা, এঁকে এঁর বাড়ী পৌঁছে দে, তখন আর একদিন আসিস্, তোর সঙ্গে অনেক কথা কইব।" দেবেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের পদধূলি লইয়া, নৌকারোহণ করিতে গেলেন। রামকৃষ্ণদেব সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া কহিলেন, "দেখ, ঘরে গিয়ে একজন ভাল ডাক্তার দেখিও। আর আরাম হলে আবার এসো, আবার আস্‌বে ত?" দেবেন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ভক্তও তাঁহার পদধূলি লইয়া নৌকায় উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিলেন, "আর একদিন আসিস্, অনেক কথা আছে।"

পাঁজরায় বিষম বেদনা, জ্বরও তেমনি জোরে আসিল। নৌকায় বসিয়া তথাপি দেবেন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের কথাই কহিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গঙ্গা হইতে জল লইয়া বেদনা স্থানে দিতে লাগিলেন। আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া দেবেন্দ্র ভক্তকে কহিলেন, "আমি বাড়ী আপনি যেতে পার্‌ব, আপনি যান ; কেন আর আমার সঙ্গে কষ্ট কোরে আস্‌বেন!"

ভক্ত কহিলেন, "সে কি মশাই, জ্বর অবস্থায় আপনি একলা কেমন কোরে যাবেন? আমার কোন কষ্ট হবে না, চলুন।"

দেবেন্দ্র একেবারে নাছোড় হইয়া কহিলেন, "না মশাই আমার এইখানেই একজন আত্মীয়ের বাড়ী আছে, আমি সেইখানেই যাব। আপনি আর কষ্ট করবেন না। আপনাকে ঢের কষ্ট দিয়েছি, আর কষ্ট দেব না। আমি আপনি বেশ যাব এখন। আপনি যান, বাড়ী যান।" এই বলিয়া দেবেন্দ্র যেন নেশাগ্রস্ত হইয়া, ভক্তের হাত ছিনাইয়া, দ্রুতপদে উক্ত আত্মীয়ের আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের বৈঠকখানায় বসিলেন, এবং একজনকে কহিলেন, "আমার বড় জ্বর হয়েছে, পাঁজরায় বিষম বেদনা, আর কথা কইতে পারছিনি। তোমরা একখানা পাল্‌কি ডেকে দেও, আমি বাসায় যাব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেবেন্দ্র জ্বরে ও বেদনায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। এক-চল্লিশ দিন পরে তাঁহার পুনরায় জ্ঞান আসিল ; দেখিলেন, তিনি নিজ আবাসে নহেন, তাঁহার সেই আত্মীয়ের আলয়েই আছেন। জ্বরের অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কেবল বলিয়াছেন, "ঠাকুরবাড়ীতে শৌচ-প্রস্রাব করা হচ্ছে, ভাল হচ্ছে না।" আর মধ্যে মধ্যে পরমহংস-দেবের কথা কহিয়াছেন। এই কথা তাঁহার আত্মীয়েরা বলিলেন। তখন দেবেন্দ্রের পুরাতন স্বপ্ন স্মৃতিবৎ মনে পড়িল ; অসুস্থাবস্থায় যখনি যন্ত্রণায় চক্ষু খুলিয়াছেন, তখনি শিয়রে রামকৃষ্ণদেবকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। আরোগ্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, 'ও সমস্ত মস্তিষ্কের খেয়াল।' নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া ভাবিলেন, "লোকের সাধু দর্শনে মঙ্গল হয় ; একি বাবা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি ! ঢের হয়েছে, আর ওমুখো নয় ; সাধু আছেন, আমার মাথায় থাকুন !"

কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশব আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়ায়, আজ কয়েক বৎসর তাঁহার অনেকগুলি স্বাধীনচেতা ভক্ত, তাঁহার দল ছাড়িয়া একটী ভিন্ন দলের সৃষ্টি করতঃ, তাহার নাম

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' রাখিয়াছেন। এই বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেশব প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা কন্যার বিবাহের বয়সের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এখন কেশব তাঁহার আপনার কন্যাকে তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ দিতে নানা কারণে বাধ্য হইলেন। তজ্জন্যই সমাজে এই দলাদলি উপস্থিত হয় এবং দলভুক্ত লোকেরা কেশবের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায়। রামকৃষ্ণের নিকট কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বিরুদ্ধদল—উভয়পক্ষই আসা যাওয়া করিতেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা কেশবের ঐ ব্যবহার স্বার্থপরতাদুষ্ট বলিতে ত্রুটি করিতেন না। রামকৃষ্ণদেবের নিকট একদিন কেশব উপস্থিত আছেন, এমন সময় অপর পক্ষীয়েরা ঐ ঘটনার প্রসঙ্গ উথাপিত করিলে তিনি বলিলেন—"কেশব, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভগবানের হাত। তুমি ঐ সম্বন্ধে আইন কর্‌তে গেলে কেন? আর তুমি লোক চিনে দলে নিতে পার না? ওপর ওপর দেখ্‌লে লোকগুলি সব একই রকম। কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখলে দেখবে, ওদের কেউ সত্ত্বগুণী, কেউ রজোগুণী, আবার কেউবা তমোগুণী; যেমন পুলিপিটে, ওপরে সকলগুলি একই রকম, কিন্তু কারুর মধ্যে কলায়ের পূর, কারুর মধ্যে নারকেলের পূর, আবার কারুর মধ্যে ক্ষীরের পূর। তুমি যাকে পেয়েছ, তাকেই দলে নিয়েছ; তাতেই ত তোমার দল ভেঙ্গে গেল।" রামকৃষ্ণদেব কেশবকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। সাধারণ সমাজেরও প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট। প্রবাদ আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মহাভক্ত শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী সাধনবলে অবগত হইয়াছিলেন যে, শ্রীভগবান্‌

স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, হরিনাম প্রচারের একজন প্রধান সহায় হন। অদ্বৈত প্রভু ইতিপূর্ব্বে বেদান্তবাদী ছিলেন এবং জ্ঞান বিচারেই কাল কাটাইতেন; কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধা ভক্তির উদয় হওয়ায়, পরে তিনি জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিলেন। বিজয় সেই অদ্বৈতবংশোদ্ভব; তাই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পার্ষদ ভক্তদের বলিলেন, "দেখ, বিজয়টী বেশ, প্রভুবংশে জন্ম, একটু নেড়ে চেড়ে দিলেই এখনি চৈতন্য হয়।" ভক্তেরা সকলে বলিলেন—"হ্যাঁ মশাই। ওঁর মত 'মন মুখ এক' লোক দেখা যায় না। দিননা একটু নেড়ে চেড়ে।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"তা মার ইচ্ছা হলেই হবে, এখানে এলে গেলেই হবে।" তাই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিয়াছেন। কিন্তু বিজয়ের সাংসারিক অবস্থা বড়ই মন্দ, অতিকষ্টে দিনপাত হয়। ঐ কারণে ব্রহ্মসমাজে একটী চাকরি স্বীকার করিয়াছেন, অনেক খাটিতে হয়, এজন্য সময়াভাব; তারপর অর্থাভাবের জন্যও গাড়ী বা নৌকা ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ইচ্ছামত আসিতে পারেন না। বিজয় কিন্তু কিছুদিন না আসিলেই রামকৃষ্ণদেব তাঁহার কোন ভক্তকে দিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহার যাতায়াতের খরচ যোগাড় করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলি নিজের মত 'ন্যাজা মুড়ো বাদ দিয়া' লইতেন; বিজয় কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের উপর এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার প্রত্যেক কথাই ক্রমে সত্য বলিয়া মানিতে লাগিলেন ও তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতেও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিজয় বড় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যাহা সত্য বলিয়া একবার বিশ্বাস হইত, তাহার জন্য প্রাণ

পণ করিতেন। বলা বাহুল্য, ঐ জন্যই তিনি বংশগৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও রামকৃষ্ণের উপদেশ বাক্য সকল বিজয়ের দিন দিন যত সত্য বলিয়া ধারণা হইতে লাগিল, ততই তাঁহার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রামকৃষ্ণ-দেবও এই সময়ে কখন কখন কলিকাতায় যাইয়া বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

"আজ অনেক দিন হ'ল, বিজয় আসেনি। তার জন্য মনটা কেমন হয়েছে, তাকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়েছে। বলরাম, তুমি তাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এস। আস্‌বে?" রামকৃষ্ণদেব একদিন বলরামকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি সম্মত হইলেন এবং পরদিন বিজয়কে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। সকলে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে, নানা কথার পর বদ্ধ জীবের কথা পড়িল। ঠাকুর বলিলেন—"যারা বদ্ধ জীব, তাদের কোন মতেই চৈতন্য হয় না। সংসারে এত দুঃখ কষ্ট পায়, তবু একটুও হুঁষ হয় না। আবার কোন রকমে যদি সংসার থেকে একটু দূরে গিয়ে পড়ে ত মাগ ছেলের জন্য হেদিয়ে মরে। যেমন গুয়ের পোকা, বিষ্ঠাতেই বেশ থাকে ও আনন্দ পায়; ভাতের হাঁড়ীতে রাখ্‌লে মরে যায়।"

বিজয়ের অন্তঃকরণে ঐ কথায় মহা আঘাত লাগিল, ভাবিলেন—"তবে কি হবে? বদ্ধ জীবের কি কোন উপায় নেই?" ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশাই বদ্ধ জীবের তবে ভগবান্‌ লাভ কেমন ক'রে হবে?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন—"তীব্র বৈরাগ্য হলে, কামকাঞ্চনের হাত এড়াবে, তবে ঈশ্বরের কৃপা হবে। সাধন ভজন—হবে এখন, আজ না হয় কাল হবে—এ হল মন্দ বৈরাগ্য। যার প্রাণ একেবারে ব্যাকুল

হয়ে ভগবানের দিকে ছোটে, কোন বাধা মানে না, ভগবান্ লাভের জন্য অস্থির হয়, মাগ ছেলে সংসার যেন কাল সাপ দেখে, কেবল ঈশ্বরের জন্য লালায়িত, আর কিছুই চায় না—তারই তীব্র বৈরাগ্য। কেমন জান, এক সময় অনাবৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু চাষারা চাষ দিতে ছাড়ে নি। জল হয় না, কি করে—সবাই খাল কেটে নদী থেকে জল আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। সবাই রোজ একটু একটু কাটে। একজন ভাব্‌লে আজই খালে নদীতে যোগ করে দেব, নইলে কাল যদি মরে যাই, ছেলেগুলো সব ত না খেয়ে মোরে যাবে! এই ভেবে সে এক নাগাড়ে কেটে চল্‌ল। এদিকে বেলা অনেক হ'ল, তার গিন্নী মেয়েকে দিয়ে মাঠে তেল পাঠিয়ে চাষাকে নাইতে বোলে পাঠালে। মেয়েটি চাষার এক ধমক্ খেয়ে পালালো। গিন্নী বেজায় বেলা হ'ল দেখে মনে কর্‌লে, যাই মিন্‌সেকে আমিই একবার বুঝিয়ে বলি, ভাল জ্বালা, আজ আবার কি ঘাড়ে ভুত চাপ্‌লো! আমি হাঁড়ী নিয়ে আর কত কাল বসে থাক্‌ব? একটা বিবেচনাও কি নেই যে, হ্যাঁ, খেয়ে নিয়ে কাজ করি? কাজের হ্যাঁপায় নিজের ক্ষিদে তেষ্টা নেই বলে কি সবার তাই? মাগী আপনার মনে বক্‌তে বক্‌তে এসে মিন্‌সেকে বল্‌লে, 'বলি হ্যাঁগা, ভাতগুলো যে কড়কড়িয়ে গেল, নেয়ে খেয়ে—।' মিন্‌সে, 'তবেরে হারামজাদি.' বোলে কোদাল উঁচিয়ে তাড়া কর্‌লে। মাগী দৌড়! মিন্‌সে অমনি আবার মাটী কাট্‌তে লেগে গেল, তার আর কোনদিকে হুঁষ নেই। সন্ধের একটু আগে নদীর সঙ্গে যোগ কর্‌লে, আর অমনি কুল কুল করে খাল দিয়ে ক্ষেতে জল আস্‌তে লাগ্‌লো। চাষা তখন মহানন্দে একদৃষ্টে হাস্‌তে হাস্‌তে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর মাগীকে বল্লে, 'নে, এখন তেল দে।' তার পর তেল মেখে, নেয়ে, খেয়ে, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতে লাগ্‌লো।—এরই

নাম তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান্ লাভ আজই কর্‌বো, এখনি কোরে তবে আর্ কাজ।"

তিনি একটু পরেই আবার বলিতে লাগিলেন—"আর একটা গল্প শোন। একজনের স্ত্রী একদিন তার স্বামীকে বল্লে, 'দাদা আজ কদিন থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যিসী হবার চেষ্টা কর্‌ছে, খাওয়া কমিয়েছে, মাটীতে শোয়, বউয়ের সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না। তাই বড় ভাব্‌না হয়েছে পাছে সন্নিসী হয়ে বেরিয়ে যায়।' তার স্বামী বল্লে, 'দূর্ ক্ষেপী, সে যাবে না, মিছে কথা, সন্ন্যিসী কি অমন কোরে হয়?' স্ত্রী বল্লে, 'ওগো, না, সে যে কাপড় ছুবিয়েছে, সব ঠিক করেছে, নিশ্চয় যাবে। তোমার যেমন কথা, অমন কোরে হয় না ত কেমন কোরে হয়?' তার স্বামী বল্লে, 'কেমন কোরে হয়, দেখ্‌বি? এই এমনি কোরে হয়'—বলে নিজের পরা কাপড় খানি ছিঁড়ে কোপ্‌নি ক'রে পোরে বেরিয়ে গেল, আর এল না।—এর নাম তীব্র বৈরাগ্য। সন্ন্যাসী হবার কথা শুনেই অমনি চৈতন্য হল, অমনি সব ত্যাগ করে চলে গেল।" প্রভুর কথায় ব্রহ্মচারী ভক্তদের যেমন আনন্দ হইতে লাগিল, তেমনি বিজয়ের মজ্জায় মজ্জায় এই কথাগুলি বসিতে লাগিল।

সেদিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার একটী অনুরক্ত ভক্তের শোক সংবাদে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। এঁড়িয়াদহ নিবাসী বিষ্ণুনামধারী জনৈক যুবক, বয়ঃক্রম আন্দাজ কুড়ি বৎসর, রামকৃষ্ণদেবকে বড়ই ভক্তি করিতেন এবং সদা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতে ভাল বাসিতেন। পাঠাবস্থায়, বিদ্যালয়ে না যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতেন বলিয়া, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে অতিশয় ভৎর্সনা ও উৎপীড়ন করিতেন। বালক এই লাঞ্ছনার সমস্ত কথা রামকৃষ্ণদেবকে বলিতেন। রাম-

কৃষ্ণদেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও এই জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিকট কম কম আসিতে বলিতেন। বিষ্ণু কিন্তু সে কথা শুনিতেন না; বলিতেন—"মশাই আমার সংসার ভাল লাগে না, সদাই পালাই পালাই মনে হয়, আপনার কাছে না এলে যাই কোথা?" জালায় যন্ত্রণায় বিষ্ণু গৃহ হইতে কিছুদিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে কোন এক আত্মীয়ের নিকট যাইয়া থাকিলেন। তথায় বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে বিচরণ করিতেন, আর নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতেন। কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যের ভাব বুঝিতে না পারিয়া, আবার তাঁহাকে লেখা পড়া, চাকৃরি বাকৃরির জন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে বিষ্ণু কহিলেন—"দেখ, তোমাদের আচরণে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। এই দেহটা তোমাদের—তাই এত অত্যাচার? আচ্ছা"—এই বলিয়া রামকৃষ্ণদেবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন কিন্তু কোন কথা ভাঙ্গিলেন না। কেবল বলিয়াছিলেন "বোধ হয় আর আমি আপনার নিকট আসতে পারব না।" কিছুদিন পরেই সংবাদ আসিল—"বিষ্ণু গলায় ছুরি দিয়াছে!' আজ বিষ্ণুর এইরূপে দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া অবধি রামকৃষ্ণদেব, অতি বিমর্ষভাবে মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুর অশেষ গুণের কথা বলিয়া, শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসিলেন—"মহাশয় আত্মহত্যা ত মহাপাপ—সকলেই এই কথা বলে। এ ছেলেটী যদি এমন ভাল ত আত্মহত্যা করলে কেন?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"হঁ্যা, আত্মহত্যা মহাপাপ, ঐ পাপে ফিরে ফিরে আসৃতে হয়, আর কতই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তবে কি জান, মাটির ছঁাচ ততক্ষণ দরকার, যতক্ষণ না একটা গড়ন ঢালাই

কোরে নেওয়া হয়। ঢালাই কাজ হয়ে গেলে কারিকর ছাঁচ ভেঙে গড়নটা বার কোরে নেয়। ঈশ্বর লাভ বা জ্ঞান হবার জন্যই শরীরটার দরকার, ঈশ্বর লাভ হয়ে গেলে যে কোন রকমে শরীরটা গেলেও আর দোষ হয় না। বিষ্ণুর হয়ত পূর্ব্বজন্মে সব করা ছিল, একটু আধটু বাকী ছিল, তা এ জন্মে ক'রে গেল। পূর্ব্বজন্মটাও মানতে হয়। একজন একটু সাধন ভজন করলেই অনেক এগিয়ে যায়, আবার একজন অনেক কোরে একটু আধটু পায়। একজন শবসাধন কর্‌ছিল। একটা জঙ্গলে মড়ার উপর বসে জপ কর্‌তে কর্‌তে ভয় পেলে, আর অমনি তাকে বাঘে নিয়ে গেল। একটু দূরে একজন বেড়াতে বেড়াতে এই ঘটনা দেখে মনে কর্‌লে—'বাঃ এমন সুযোগ ছাড়া হবে না।' সে শবের উপর বসে জপ আরম্ভ কর্‌লে, আর একটু জপ কর্‌তেই মার কৃপা হল। দর্শন দিয়ে মা বল্লেন—'আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি, বর নেও।' সে বল্লে—'মা, এ বড় আশ্চর্য্য কথা! ও লোকটা এত পরিশ্রম করে তোমার আরাধনা কর্‌লে, তাকে বাঘে নিয়ে গেল! আর আমি সাধন ভজন কিছুই জানিনি, একবার মাত্র তোমায় ডাক্‌তেই তোমার কৃপা হল! এর মানে কি আগে আমায় বল, তারপর বর দিও।' মা বল্লেন, 'ওরে অমন কত জন্ম তুই সাধন ভজন করিছিস্, কত বিঘ্ন হয়েছে, কত জন্ম জন্মান্তর আমায় ডেকেছিস্ দেখা পাস্‌নি। সেই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই আজ আমার দেখা পেলি"।

সকলেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। বিজয় প্রশ্ন করিলেন—"মশাই, ঈশ্বর লাভের উপায় কি? তাঁর কৃপা কেমন করে লাভ হয়?"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "প্রেম ভক্তি হলেই হয়। জপ তপ, সাধন ভজন, স্মরণ মনন, সব প্রেম ভক্তি হবে বলেই কর্‌তে হয়।

এক ডাকে তাঁর দেখা পেলুম না বলে হতাশ হওয়া উচিত নয়। খানদানী চাষা যদি বার বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তবুও চাষ ছাড়ে না। বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে হবে না। বারুদে একটুও জল থাক্‌লে, আর তাতে আগুন লাগে না। তেমনি আলে একটী গর্ত্ত থাকলে ক্ষেতে যত জল ছেঁচনা, সব বেরিয়ে যায়, একটুও থাকে না। চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই, কর্ম্ম করে। তাঁর নাম জপ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন তাঁর নাম কর্‌লেই রোমাঞ্চ হয়, চক্ষে জল আসে। ক্রমে তাঁর দর্শন পায়।"

সন্ধ্যা হইল। সকলে বিদায় হইলেন।

বিজয়ের মনে বৈরাগ্যের ভাব বাড়িতে লাগিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের চাকরি গ্রহণ করিয়া অনেক কাজে কর্ম্মে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কর্ম্মবন্ধন শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসার কোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরারাধনা করিবার পিপাসা ততই বলবতী হইতে লাগিল। আবার এদিকে পরিবারবর্গের কোন একটা উপায় না করিয়া সংসার পরিত্যাগই বা কেমন করিয়া করেন? এইরূপ মানসিক অবস্থায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্য্যের ভার লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺গয়াধামে গমন করিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মচারী ভক্তেরা প্রায় সকলেই তাঁহার কাছে আছেন—এমন সময়ে কেশব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশ-বের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তার পরে রামকৃষ্ণদেব বলিলেন—"ও কেশব, তুমি কেমন বক্তৃতা দেও, বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখেনে তুমি কিছু বল, শুনি।"

কেশব বলিলেন, "মশাই, আমি ত বলেছি—আমি আপনার দুই একটী উপদেশ নিয়ে তারই উপর কিছু বলি। এখানে আপনার কাছে কি বল্‌ব? আমি ত কামার দোকানে ছুঁচ বেচ্‌তে আসিনি। আপনার উপদেশ শুন্‌তেই আসি। আপনি বলুন, আমি শুনি।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তা নয়, কেশব, তুমি কেমন বল তাই শোন্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে। আজ কিছু বল।" এই প্রকার জিদ করিলে কেশব অগত্যা বক্তৃতা দিতে উদ্যত হইলেন। সকলে ঘাটের চাঁদনিতে গমন করিলেন, কেশব বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন :—

"আমরা দেখিতেছি, এইখানে প্রেম-নদীতে ভগবানের পাদ-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা সেই পাদ-পদ্ম অবলম্বন করিয়া প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইব।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতান্তে রামকৃষ্ণদেব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ও কেশব, নদীতে যে পদ্ম হয় না; স্রোতের জলে কি পদ্ম জন্মায়? সরোবরে জন্মায়। তুমি প্রেম-নদী না বলে প্রেম সরোবর বল্লে ঠিক হোতো।"

কলিকাতায় নন্দনবাগাননিবাসী জনৈক ব্রাহ্মভক্ত এই সময়ে রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেন। তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে একদিন রামকৃষ্ণদেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য রামকৃষ্ণদেব রাখালকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইলে কেহই তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাঁহারা যাইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। সঙ্গীতাদির পর ভোজনার্থ সকলকে আহার করিতে ডাকা হইল, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব ও রাখালকে কেহই ডাকিলেন না। ইহা দেখিয়া রাখাল বলিলেন, "চলুন মশাই আমরা চলে যাই, এখানে বড় সুবিধে নয়।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "এত রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কি খাবি? সমস্ত রাত কি উপোষ করে থাক্‌বি?"

রাখালের রামকৃষ্ণগত প্রাণ। এখানে তাঁহার অনুরূপ খাতির যত্ন হইতেছে না দেখিয়া প্রথম হইতেই বিরক্ত হইয়াছেন, আবার সকলকে ভোজনে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ আহার করিতে ডাকিল না—কাজেই রাখালের আর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "হঁ্যা মশাই, উপোষ করেই থাক্‌ব, তার ভয় কি? আপনি চলুন, যাই।"

বালকের ন্যায় অভিমান-শূন্য রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুই উপোষ কর্‌গে যা, আমি পার্‌ব না। আমি নেমতন্নে এসেছি—লুচি খাবো, তবে যাবো।"

রাখাল বলিলেন, "আপনার জন্যে সেখানে কিছু না কিছু যোগাড় হবে না কি? আপনি চলুন।" রামকৃষ্ণদেব কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। রাখাল কাজেই ক্ষুণ্ণ হইলেন।

তখন রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "নারে, আমি তা বল্‌ছিনি। কি জানিস্, সাধু সন্ন্যিসী গেরস্থের বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থের বড় অকল্যাণ হয়। তাই আমি কিছু না খেয়ে যাব না।" এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ওগো আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তোমরা আমায় কিছু খেতে দেও।" বলিতে বলিতে পুঙ্‌ক্তির এক প্রান্তে আসিয়া যেখানে সকলের জুতা পড়িয়া আছে সেইখানে আসিলেন, একজন স্ত্রীলোক দুইখানি পাতা সেইখানেই পাতিয়া তাহাতে কয়েকখানি লুচি দিয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব রাখালকে বলিলেন, "ওরে দেখিস্, আমাদের জুতগুলো যেন হারায় না। সাবধান, লুচি খেতে যেন জুত

খোয়াস্ নি।" রাখাল জুতা সাবধানে নিকটে রাখিয়া অনিচ্ছাসত্বেও অগত্যা তাঁহার সহিত ভোজনে বসিলেন। এদিকে লুচি এলো ত তরকারি আর আসেই না। রাখালও ততই ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। কাজেই রামকৃষ্ণদেব কেবল লবণ সংযোগে কয়েকখানি লুচি খাইয়া হৃষ্টচিত্তে রাখালকে বলিলেন, "এখন যাহা হোগ কিছু খাওয়া হয়েছে, এখন চল্।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কেশব সভা সমিতি করিয়া, বক্তৃতা দ্বারা, ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে, উত্তর ভারতের অনেক স্থানে ধর্ম্মালোচনার একটী ঢেউ উঠিল। কলিকাতার ত কথাই নাই—কলিকাতার প্রায় ঘরে ঘরে যুবকবৃন্দের মধ্যে কেশবের মতানুযায়ী ধর্ম্মচর্চ্চার একটা প্রবল স্রোত বহিতে থাকিল। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক বিদ্যা-লয়ের উচ্চ শ্রেণী সমূহে, ঐরূপে এক একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির চর্চ্চা হইল। আবার কেশবের ব্রাহ্মসমাজ হইতে রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব উক্তি ও ধর্ম্মভাব নানারূপে প্রসৃত হইয়া ছাত্রমণ্ডলীকে রামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। শশী ও শরৎ এই স্রোতে পড়িয়া রাম-কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন। শশী—শরতের পিতৃব্য পুত্র। উভয়েই চাঁপাতলায়, একই বাটীতে থাকিতেন। শশী, কেশব বাবুর বিদ্যালয়, আলবার্ট স্কুলে পড়িতেন। কাজেই কেশবের বক্তৃতা ও প্রচার কার্য্য ইঁহাদের দেখিবার ও জানিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। আবার প্রবে-শিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইঁহারা আলবর্ট স্কুলে বালক-দিগের দ্বারা গঠিত একটী সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামকৃষ্ণদেব একদিন কেশবের সমাজমন্দিরে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সরল মধুর ভাষায় ঈশ্বর বিষয়ে আলাপ করিয়া সমাগত

সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার আগমনে কেশব বেদী ছাড়িয়া দিয়া উপাসকদিগকে তাঁহার কথাই শুনিতে বলিলেন। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার লোকে ঈশ্বরী প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাণর কথা জানিতই না। রামকৃষ্ণ-দেবের ঐরূপ হইতে দেখিয়া সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইতে লাগিল! আলবর্ট বিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত সমিতির কয়েকজন বালক সে দিন সমাজে উপস্থিত ছিল। তাহারাও অবাক্ হইয়া ঐ মহাপুরুষের ভাবাদি দর্শন করিয়া ভক্তিপ্রেমে বিগলিত হইল এবং স্থির করিল যে সমিতির বাৎসরিক প্রতিষ্ঠার দিনে তাহারা সকলে মিলিয়া নৌকারোহণে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া. তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিবে। ঐ বালক-দিগের নিকট হইতেই শশী ও শরৎ রামকৃষ্ণদেবের বিষয় জানিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য মনস্থ করিলেন। শশী সে বৎসর এফ্ এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং শরৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পড়িতেছেন। সমিতির সাংবাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইলে তাঁহারাও সমিতির যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পরে তাঁহারা যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রামকৃষ্ণদেব আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। সুতরাং সকলে মিলিয়া পঞ্চবটীর তলে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষারোহণ, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি খেলাধূলায় কিছুক্ষণ কাটাইলে, পরে নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে মুড়ী কিনিয়া আনিয়া দুজনে জলযোগ করিয়া প্রায় ৩টার সময় রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবের নিকট তখন দুই তিন জন মাত্র লোক রহিয়াছে এবং তিনি ছোট চৌকিখানির উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলে পূর্ব্বের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামকৃষ্ণদেব বালকদিগকে সহাস্যমুখে নিকটে আসিতে বলিলেন এবং বালকদ্বয়ের বসিবার জন্য নিকটস্থ একজন

সেবককে একখানি মাদুর পাতিয়া দিতে বলিলেন। সকলে উপবেশন করিলে তিনি তাঁহাদের নামধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাদের কেশবের সমাজে যাওয়া আসা আছে জানিয়া সুখী হইলেন। বলিলেন, "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। চারাগাছে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, নইলে ছাগল গরুতে মুড়িয়ে নষ্ট করে। ইট বা টালি যদি কোন ছাপ শুদ্ধ পোড়ান হয় ত পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তিলাভ করে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তা হ'লে সে ভক্তি চিরকাল থাক্‌বে, কামকাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেল্‌তে পার্‌বে না। এখনকার বাপ মায়েরা ছেলেবেলায় বালকদের বে দিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করে দেয়। ইস্কুল থেকে ছেলে যখন লেখা পড়া শিখে বেরুলো, তখন সে প্রায়ই তিন চারটী ছেলের বাপ! সেগুলিকে খাওয়াবার জন্যে কাজেই তাকে টাকা টাকা করে ছুটে বেড়াতে হোলো। তারপর হয়ত অনেক চেষ্টায় একটী ৩০।৪০ টাকার চাকুরি জুটলো। ঐ কটী টাকার ভেতর সে তাদেরই বা খাওয়ায় কি, আর নিজেই বা খায় কি? কাজেই রোজগারের চিন্তায় সে ব্যতিব্যস্ত। ধর্ম্ম, ঈশ্বর চিন্তা সে করে কি কোরে?" বালকদের মধ্যে একজন তাঁহার ঐ কথায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি, মশাই, বিবাহ করা অন্যায়, ভগবানের ইচ্ছা নয়?" তদুত্তরে রামকৃষ্ণদেব বালককে "মুক্তি ও তাহার সাধন" নামে বইখানি সারদাল হইতে পাড়িয়া আনিতে বলিলেন। বই আনা হইলে আবার বলিলেন, "অমুক পাতায় অমুক জায়গাটা পড়"। বালক পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন, গ্রন্থকার যিশুর এবং তচ্ছিষ্য পলের বিবাহ সম্বন্ধীয় মত ঐস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। লেখা আছে, "বিবাহ সকলের জন্য নহে। ভগবান্ কাহাকেও জন্ম-নপুংসক

করিয়াছেন, আবার কেহবা ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া নপুংসকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন ;—বিবাহ ইহাদের উভয়ের জন্য নহে। কিন্তু বিবাহ করিবার প্রবল বাসনা যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে বিবাহ আবশ্যক। তাহাদের বাসনাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা অপেক্ষা বিবাহ করাই উচিত।" পাঠ শেষ হইলে, রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "বিবাহই সকল বন্ধনের মূল।" শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অপর একজন দেখিল যে, রামকৃষ্ণদেব বিবাহের আদৌ প্রশ্রয় দেন না। বোধ হয়, সে তখন অবিবাহিত, অথচ মনে সে ইচ্ছা বলবৎ বিদ্যমান। সে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"তবে কি, মশাই, বিবাহ করা ভগবদিচ্ছানুমোদিত নয় ? লোকে বিবাহ না করিলে ভগবানের সৃষ্টিই বা কেমন করে থাকবে ?"

রামকৃষ্ণদেব হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,"তা কেন হে, যার ইচ্ছা হবে, সে খুব বিয়ে কর্‌বে। ও একটা কথা আমাদের মধ্যে হয়ে গেল। আমার কথা আমি বলে যাচ্ছি, তুমি নেজা মুড়ো বাদ দিয়ে নাও না হে।" এইরূপ নানা ঈশ্বরীয় কথার পর বালকেরা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। শশী ও শরৎ ভাবিলেন, "এইবার থেকে এঁর কাছেই আস্‌ব। ধর্ম্ম কর্ম্ম যদি শিখ্‌তে হয়, তবে এঁর কাছে আসাই ঠিক।" এই ভাবিয়া তাঁহারা দুই জনেই রামকৃষ্ণদেবের নিকট অবকাশ মত আগমন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর মনোভাব গোপন রাখায়, আর তাঁহাদের একত্রে আসা বহুদিন ঘটিল না।

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ রোগমুক্ত হইয়া নিজ গৃহেই থাকেন। ঈশ্বর-লাভের জন্য আর তেমন তীব্র পিপাসা নাই ; তবে তাহা একেবারে বিলুপ্তও হয় নাই। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইয়াই পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে,

মনে কেমন একটা আতঙ্ক হইয়াছে, সেজন্যই আর তাঁহার কাছে যাইবেন না, স্থির করিয়াছেন। দেহ পুনরায় সবল হইলে, যদি কখন মনে হইত, যাই একবার দক্ষিণেশ্বরে, অমনি আপনাকে আপনি বুঝাইতেন, "সেখানে গেলে বুঝি তিনি চতুর্ভুজ ভগবান্ দেখিয়ে দেবেন ? এইত গিয়াছিলে, কেমন ভগবান্ দেখে এলে বাপ প্রাণ নিয়ে টানাটানি ! তার চেয়ে যা রয় সয়, তাই করনা কেন ? ব্রাহ্মণের ছেলে, নিঃসম্বল ত নও, গায়ত্রী জপটাই বেশ করে কর না কেন ?" এইরূপ স্থির করিয়া নিষ্ঠা পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উহাতে এমন নেশা হইল যে, এক একদিন সমস্ত রাত্রিই গায়ত্রী জপ করিলেন। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্লি রাম' হইল। জপের ফলে যত মন হইতে ভয় ইত্যাদি সঙ্কোচভাব দূর হইয়া যাইতে লাগিল, ততই মনে উঠিতে লাগিল, "ভগবান্কে লাভ করতে হলে গুরু চাই। যে গুরু ভগবান্কে সাক্ষাৎ দেখেছেন এবং জানেন, এমন গুরু চাই।" আবার সেই পুরাতন গুরু অন্বেষণের পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের কাছে আর যাওয়া হইবে না, স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; সেখানে গেলেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, একদিন বৈকাল বেলা কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, এক বন্ধুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বৈঠকখানায় কেহই নাই। ভাবিলেন, একটু অপেক্ষা করি, এখনি কেহ না কেহ আসিবে। এই ভাবিয়া দেবেন্দ্র বসিলেন এবং একখানি বঙ্গবাসী সংবাদ পত্র পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, তাহা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে সংবাদের উপর প্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তাহা এই মর্ম্মে, "অদ্য বৈকালে বাগবাজার বসু পাড়ায় শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তদিগের সহিত মিলিত

হইবেন।” পাঠমাত্র তাঁহার সেখানে উপস্থিত হইতে প্রবল ইচ্ছা হইল। রামকৃষ্ণদেবের কাছে আর যাইবেন না, ইত্যাদি এত যে মনকে ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছিলেন, সে সব যেন কোথায় ভাসিয়া গেল এবং কে যেন তাঁহাকে ঐস্থানে লইয়া যাইবার জন্য টানিতেছে, এইরূপ অনুভব হইতে লাগিল। আর থাকিতে পারিলেন না। বেলা প্রায় অতীত, তখনই বাগবাজার যাত্রা করিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় খুঁজিয়া খুঁজিয়া বলরাম বসুর বাটী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—অসীম জনতা; রামকৃষ্ণদেব যেন বাহ্যশূন্য, উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। উপস্থিত সকলের কেহবা কীর্ত্তন গাহিতেছেন, কেহবা তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কেহবা বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদের প্রতি তাকাইয়া হৃদয় পবিত্র করিতেছেন, সকলেই যেন এক অপূর্ব্ব প্রেম তরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা। দেবেন্দ্র ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উহা দেখিলেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু কেমন একটা লজ্জা বাধা দিতে লাগিল, কারণ, অনেক দিন যান নাই এবং আর যাইবেনও না, মনে করিয়াছিলেন। কেন এতদিন আসেন নাই জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবেন? দেবেন্দ্র ‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ ভাবে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। আবার, রামকৃষ্ণদেব কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে প্রেমে বালকের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবে নৃত্য করিতেছেন, দেবেন্দ্রের মনও তাঁহার সহিত উল্লাসে নৃত্যশীল হইয়া অপূর্ব্বভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে রামকৃষ্ণদেব ভাব সম্বরণ করিলেন। কীর্ত্তন বন্ধ হইল। সকলে যাইয়া অমনি তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিলেন। তখনও রামকৃষ্ণ যেন ভাবের ঘোরে আছেন; কোন কথা কহিতেছেন না। দেবেন্দ্র ভাবিলেন, “এই সুযোগ, এইবার পদধূলি

গ্রহণ করি। এ ভিড়ে, আর ওঁর এরূপ অবস্থায়, কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।" অগ্রসর হইয়া ভিড় ঠেলিয়া, তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিবামাত্র, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আদরে হাত দিয়া বলিলেন, "কৈ হে তুমি যে আর যাও না? কেমন আছ? তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তুমি আর যাও না কেন?" দেবেন্দ্রনাথ মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মশাই বড় অসুখ করেছিল।" রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "তুমি আবার যেও, ওখানে যেও। যাবে ত?" কাজেই দেবেন্দ্র নাথ বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ যাব, যাব বৈকি।" দেবেন্দ্রনাথ সে কথায় অন্যথা করিতে পারিলেন না এবং তদবধি অবসর মত তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুত নবীন চৌধুরী মহাশয় যোগীনের পিতা, দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশোদ্ভব। এককালে ইঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন, এখন কিন্তু আর সে অবস্থা নাই। ব্রাহ্মণ বড় নিষ্ঠাবান্, বরাবর প্রত্যহ ফুল বিল্বপত্র দুর্ব্বা তুলসী চন্দনাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করেন আর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন। এই দুই কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম্মেই তাদৃশ আস্থা নাই। বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান যথাসাধ্য করিতে বাধ্য হইলেও ঐরূপ 'দুই নৌকায়-পা দিয়া' 'আপদ্ বালাই' বোধে বিষয়কর্ম্ম করিয়া কে কবে বিষয়সম্পত্তির উন্নতি করিতে পারিয়াছেন? চৌধুরী মহাশয়ের দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পার্থীব অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ক্রমে সুখের সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া নিবিড়ভাব ধারণ করিতে চলিল। আগতপ্রায় অন্ধকারের ভিতর একটী মাত্র ক্ষীণালোক তাঁহার অবলম্বনস্বরূপ হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্যমী ধীর বুদ্ধিমান্ ও চরিত্রবান্, সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবেন,

এই আশায় বুক বাঁধিয়া চৌধুরী মহাশয় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

রাসমণির দেবালয়ের ঘাটে তিনি প্রায়ই যাইয়া স্নান করেন এবং ইষ্ট-পূজার জন্য তথাকার উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীনও ঐ উদ্যানে কখন বা স্নান করিতে,কখন বা বেড়াইতে প্রত্যহ গমন করেন। এই যাতায়াতের ফলেই যোগীনের রামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচয়ের সুবিধা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন রাসমণির বাগানে বেড়াইতে যাইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেবের ঘরের ভিতরে বাহিরে লোকে লোকারণ্য। সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কি শুনিতেছে। ইতিপূর্ব্বে গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে যোগীন শুনিয়াছিলেন, ঐ ঘরে এক পাগ্‌লা বামুন বাস করে—সে পূর্ব্বে ঐ দেবালয়ের পূজারী ভট্টাচার্য্য ছিল। জনতার কারণ জানিতে যোগীনের ঔৎসুক্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। দুই একটী কথাতেই বুঝিলেন—যাহাকে লোকে পাগ্‌লা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনি কথা কহিতেছেন—আগন্তুক জনগণকে ভগবদ্ভক্তির তত্ত্বসমূহ এবং তল্লাভের উপায় সকল অতি সরল হৃদয়গ্রাহী কথায় সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তসহায়ে বুঝাইতেছেন। কথা শুনিতে শুনিতে যোগীনও উপস্থিত সকলের ন্যায় মোহিত! যতক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিল, যোগীন দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে রাত্র্যাগমে যখন কথার বিরাম হইল এবং সকলে যে যার বাটী প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, তখন যোগীনও অন্যমনস্ক ভাবে বাটীর দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল—"তবে কি 'পাগ্‌লা' একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ—লোকে না বুঝে পাগল বলে। নইলে এমন ভক্তির কথা, এমন ঈশ্বরপ্রেম, এমন ভাবসমাধি ইহার ভিতর হতে

কেমন করিয়া প্রকাশ হয়? যাহা হোগ এ কথাটা ভাল করে বুঝে দেখতে হবে।"

পরদিন যোগীন একেবারে রামকৃষ্ণদেবের নিকট উপস্থিত। পরিচয় জিজ্ঞাসায় তাঁহাকে নবীন বাবুর পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া রামকৃষ্ণদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে তুমি ত আমাদের চেনা ঘর গো। তোমাদের বাড়ীতে আমি তখন তখন কত যেতুম—ভাগবত পুরাণ শুনতুম—তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তাদের ভেতর অমুক অমুক আমাকে বড় যত্ন করতেন।" যাহারা সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন, যোগীনকে তাঁহাদের দেখাইয়া বলিলেন, "এঁরা দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরী, এঁদের প্রতাপে সেকালে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খেতো, এঁরা লোকের জাত দিতে নিতে পারতেন। ভক্তিমানও সব খুব ছিলেন, বাড়ীতে কত ভাগবত পুরাণপাঠ হোতো।" আবার যোগীনকে বলিলেন, "জানাশোনা হোলো, বেশ হোলো, এখানে যাওয়া আসা কোরো। মহদ্বংশে জন্ম, তোমার সব লক্ষণ বেশ আছে, বেশ আধার, খুব (ভগবদ্ভক্তি) হবে।" এইরূপ প্রথম সম্ভাষণাদির পর ভগবদ্বিষয়িণী নানা কথার আলোচনা হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণদেবের এই অপূর্ব্ব অমায়িক ব্যবহারে যোগীনের মন খুবই ভিজিল এবং তদবধি তিনি তাঁহার নিকট দুইবেলা নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিচয় ও কথাবার্ত্তার বিষয় বাটীর কাহারও নিকট ভাঙ্গিলেন না। রাসমণির বাগানে প্রত্যহ যাইতেছেন জানিলে পিতা পাছে কৈফিয়ৎ চাহেন বা যাইতে নিষেধ করেন, এ জন্য যোগীন ঐ স্থান হইতে প্রত্যহ ভাল ভাল ফুল সংগ্রহ করিয়া পিতার ইষ্ট পূজার জন্য বাটীতে লইয়া আসিতেন। রামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের

সকলেই ত এক প্রকার পাগল মনে করিতেন, তাহার উপর আবার তিনি কৈবর্ত্তের পূজারী ও শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবপ্রসাদভোজী, কাযেই তাঁহাদের চক্ষে তিনি ব্রাহ্মণমর্য্যাদাভ্রষ্ট আচারহীন বলিয়া গণ্য। মহাসম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব নবীনচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের নিকট আপন পুত্রের যাতায়াত এজন্য না-পছন্দ করিতে পারেন। এই কারণে যোগীন তাঁহার রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াতের বিষয় বাটীর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

জ্ঞানের উন্মেষ হওয়া অবধি যোগীন ঈশ্বরপিপাসু *। বাল্যকালে সময়ে সময়ে এক আশ্চর্য্য ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। এমন কি, যখন তিনি মোটে পাঁচ বৎসরের, তখনও পল্লীর সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ ঐ ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে ঘিরিয়া ফেলিত, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রৌঢ়ের বিষাদভাব ধারণ করিত। হঠাৎ ঐ ভাবনা আসিলেই আর তাঁহার খেলাধূলা ভাললাগিত না। নিভৃতে বসিয়া আকাশপানে তাকাইয়া থাকিতেন ও ভাবিতেন, "এ কোথায় আসিয়াছি—আমি ত এখানকার লোক নই!" মনে হইত, এ সকল খেলুড়ে তাঁহার খেলুড়েনহে, তাঁহার অন্য সব খেলুড়ে আছে; এ দেশ তাঁহার নয়; তিনি ঐ নীল আকাশের নক্ষত্র সকলের ভিতর কোন একটী নক্ষত্রের লোক—সেখান হইতে এখানে আসিয়াছেন। আবার মনে হইত, তিনি যদি ভিন্ন জগতের লোক, তবে এখানে কেন? এ সমস্ত কি স্বপ্ন? এইরূপ অকূলপাথার ভাবনায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেন, অথচ তিনি যে কোন্ নক্ষত্রটী হইতে আসিয়াছেন, তাহার কিছুই ঠিকানা হইত না। কেবল সেই পূর্ব্ব-

* আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

পরিচিত দেশে যাইবার জন্য প্রাণে কেমন একটা হাঁকুপাঁকু আসিয়া উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। ছেলেবেলার ঐ সব কথা বলিবার পর যোগীন বলিতেন,—"যত বড় হইতে লাগিলাম, ততই ঐ সমস্ত ছেলেমানষী ভাবগুলি কমিয়া যাইতে লাগিল।"

এইরূপে আরও কয়েক বর্ষ অতীত হইলে পর যোগীনের উপনয়ন হয়। ঐ সময় হইতে তাঁহার পূজাধ্যানাদি এত ভাল লাগিত যে, নারায়ণ পূজা করিতে করিতে ধ্যানে মগ্ন হইয়া কখন কখন দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে আগড়পাড়ার মিশনরি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠেই অধিককাল ক্ষেপণ করিতেন, অন্য সকল পাঠে বিশেষ আস্থা কখন হয় নাই। একটু বেশী বয়েসেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাঁহার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ হয়। ঐ সময়েই যোগীন রামকৃষ্ণদেবের দর্শন লাভ করেন এবং তদবধি ঈশ্বরলাভেই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা বুঝিয়া সেই দিকেই সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করেন। এইরূপে চোক ফুটবার পর হইতেই কিন্তু যোগীনের জীবনে নানা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংসারে পিতার অর্থাভাবের আভাস যোগীন বহুপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাভ্যাসও যে অর্থোপার্জ্জনের সহায় হইবে তাহাও সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু মন কিছুতেই আর সংসারের ভিতর যাইতে চায় না। রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে কামকাঞ্চন-ত্যাগেই ঈশ্বর লাভ হয়, নতুবা উহা সুদূরপরাহত, এই কথা শুনিয়া

ও হৃদয়ে ধারণা করিয়া কেমন করিয়াই বা তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরপিপাসু অন্য সকলের মত সংসারে লিপ্ত হইতে পারেন? যোগীন দেখিলেন, এ ঠিক "হয় শ্যাম রাখ, নয় কুল রাখ" গোছ ব্যাপার। প্রথম প্রথম "শ্যাম ও কুল দুইই রাখিব" বলিয়া তাঁহার মন নানা চেষ্টা করিলেও পরিশেষে শ্যামের টানই প্রবল হইয়া কুলকে ভাসাইয়া দিল। রামকৃষ্ণদেবের সহিত দর্শন ঘটিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে যোগীনের ভিতর ব্রাহ্মসমাজের ভাব কিছু কিছু প্রবেশ করিতেছিল। তাহারই ফলে নিরাকার ভগবানের উপাসনা, বিবাহ করিয়া সংসারের উন্নতি সাধন, ভারত উদ্ধারে প্রযত্ন ইত্যাদি ভাব সকল তাঁহার হৃদয়ে বেশ একটু স্থান লাভ করিয়াছিল। এখন রামকৃষ্ণদেবের আকর্ষণফলে ঈশ্বরলাভরূপ একমাত্র উদ্দেশ্যাভিমুখে জীবন পরিচালনার সংকল্প কাযেই মনের ভিতর দোটান আনিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিল। যাহা হউক, যোগীন স্থির করিলেন, বিবাহ কখনই করিবেন না, বাটী হইতে দূরে থাকিয়া, চাকরি করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা পিতার সাহায্যার্থ পাঠাইবেন এবং যতদূর সাধ্য সাধনভজনে অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন। যোগীনের ন্যায় শুদ্ধমন যখনি যেটা ধরে, তখনি সেটা কাযে পরিণত করে, আজ করিব, কাল করিব, করিয়া বৃথা সময় কাটায় না। একদিন পিতাকে বলিলেন,—"আমি দেখ্‌ছি আর বেশী লেখা পড়া আমার হবে না। মিছে স্কুলে গিয়ে সময় নষ্ট করি কেন? আমার মনে হয়, তার চেয়ে কোন একটা আপিষে গিয়ে একটা কায কর্ম্ম শিখ্‌লে কিছু রোজকার কর্‌বার উপায় হতে পারে। ইচ্ছা হয়, কানপুরে মেসো মশায়ের কাছে গিয়ে একটা চাকরি বাকরি দেখে নি।" পিতা তাহাই বুঝিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাকে কানপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

যোগীন কানপুরে তাঁহার মেসো মহাশয়ের নিকট যাইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু চাকরি জুটিল না। কাযেই সাধনভজনেই কাল কাটা-ইতে লাগিলেন। সমস্ত দিন শ্রীভগবানের স্মরণ মনন ধ্যানজপ করেন, কাহারও সহিত মিশেন না, নির্জ্জনেই কাল কাটান। চক্ষু সর্ব্বদা আরক্তিম, আর মুখের ভাব বেশ অন্যমনস্ক। দেখিলে বোধ হয়, যেন বাস্তব রাজ্য ছাড়িয়া তিনি কোন এক ভাবরাজ্যে বিচরণ করি-তেছেন। এইরূপে কয়েক মাস গত হইলে যোগীনের ভাব দেখিয়া মেসো মহাশয় তাঁহার ঐ অবস্থা উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করিয়া তাঁহার পিতাকে উহা জানাইলেন এবং লিখিলেন, "ছেলে বড় হই-য়াছে, এখন বিবাহ না দিয়া এইরূপ ভাবে কাল কাটাইতে দিলে একেবারে বয়ে যাবে" ইত্যাদি।

এই পত্র পাঁইয়া যোগীনের পিতা পুত্রের বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ ভিতরে ভিতরে স্থির করিলেন, কিন্তু সে কথা যোগীনকে কিছুই ভাঙ্গিলেন না; কারণ, ইতিপূর্ব্বে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখিয়া-ছিলেন, যোগীনকে তৎপ্রস্তাবে সম্মত করা সহজসাধ্য নহে। গাত্র-হরিদ্রা ও বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আপনার শ্যালীপতিকে লিখিলেন, "যোগীনকে বাটী পাঠাইয়া দাও—বাটিতে অসুখ" ইত্যাদি।

বাল্যকাল হইতে যোগীন বড় মাতৃভক্ত ছিলেন। পিতার ঐ চিঠির ভাবে বুঝিলেন, তাঁহার জননী পীড়িতা। কাযেই উদ্বিগ্নচিত্তে সত্বর বাটী ফিরিলেন। বাটী পৌঁছিয়াই কিন্তু দেখিলেন, সকলে আনন্দোৎসবে গা ঢালিয়াছে। তাঁহার বিবাহের সমস্তই স্থির হই-য়াছে, আগামী কল্যই তাঁহার গাত্রহরিদ্রা এবং পরদিন বিবাহ। যোগীনের মস্তকে বজ্রাঘাত! তিনি পিতাকে জানাইলেন, এরূপ

হঠাৎ বিবাহপ্রস্তাবে তিনি কোনমতে সম্মত নন। নবীনচন্দ্র পুত্রকে নানারূপে বুঝাইয়াও যখন দেখিলেন, যোগীন্দ্রের বিবাহ না করিবার প্রতিজ্ঞা সমান অটলভাবে রহিয়াছে, তখন আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করিলেন। পুত্রকে সহজেই বিবাহে সম্মত করিতে পারিবেন ভাবিয়া অপরকে বাক্যদান করিয়াছিলেন। এখন ঘটনা অন্যরূপ হওয়াতে পুত্রের জন্যই তিনি অপমানিত হইতে বসিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং রাগে ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, ইহার পর আর তিনি গ্রামের লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিবেন না, কাশী বা অন্য কোন তীর্থে যাইয়া বাস করি-বেন, কিন্তু ও কুলাঙ্গার পুত্রের তিনি আর মুখদর্শন করিবেন না ইত্যাদি। যোগীনের পূজ্যপাদ গর্ভধারিণী আসিয়া যোগীনের দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমার মাথা খাও, অমত কোরোনা, কর্ত্তার মুখ রাখ; তিনি কন্যাকর্ত্তাকে কথা দিয়ে ফেলেছেন। তুমি অমত কোর্‌লে বামুনের অপমানের শেষ থাক্‌বে না। তোমার ইচ্ছে না থাক্‌লেও তুমি আমার জন্যে বে কর।" ইত্যাকার নানাবিধ কথা কহিয়া যোগীনের মাতা যোগীনের করযুগলে অবিরল অশ্রুবরিষণ করিতে লাগিলেন। বিবাহের নামে যোগীন এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কাহারও কোন কথা তাঁহার কাণে স্থান পাইতেছিল না, কিন্তু মাতার সকরুণ নির্ব্বন্ধ 'তুমি আমার জন্য বিবাহ কর' এবং চক্ষের তপ্ত জল তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। মাতৃভক্তের প্রতিজ্ঞা মাতার অশ্রুধারায় ধুইয়া গেল—যোগীনের বিবাহ হইল।

যোগীন জননীকে সুখী করিবেন বলিয়া বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু মাতাকে ঐরূপে সুখী করিতে যাইয়া তাঁহার এতকালের আশা ভরসা সব ছাড়িতে হইতেছে, ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি

মনে ঠিক বুঝিলেন, জীবনের সমস্ত উচ্চ আশা ও উদ্দেশ্য আজ জলাঞ্জলি দিলেন, এবং তাঁহার মহা ঈপ্সিত রামকৃষ্ণ-সহবাসসুখও একেবারে হারাইলেন। ভাবিলেন, "যে প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পারে না, তার মত হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আর ভাল বাস্‌বেন? তিনি কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন থেকে সেই কামিনী কাঞ্চন নিয়েই জীবন যাপন কর্‌তে হবে। এখন আমার আর তাঁর কাছে গিয়ে কি হবে? তিনি ত ঈশ্বরলাভের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি সে পথে চল্‌তে পার্‌লুম কৈ? ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁকে বিবাহ কর্‌ব না বলায় তিনি কত আনন্দ প্রকাশ করে-ছিলেন—এখন আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাব কেমন কোরে? যিনি বে'র কথা পর্য্যন্ত কইতে পারেন না, বে কোরে তাঁর কাছে এ মুখ দেখাব কেমন কোরে?" নির্জ্জনে বসিয়া যোগীন ইত্যাকার নানা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া স্থির করিলেন, আর রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবেন না। কিন্তু অপর কেহ যোগীনের এই প্রকার মনোভাব জানিতে পারিল না। অতঃপর যোগীন বিষয়কর্ম্মাদিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে যোগীনের বিবাহের সংবাদ রামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিল। এই সংবাদ শুনিয়া যোগীনকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার মন একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল; তিনি লোকদ্বারা যোগীনকে আসিতে বলিয়া পাঠান, কিন্তু সকলেই বলেন বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত যোগীন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে, সে আর তাঁহার নামও করে না। রামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু যোগীন কিছুতেই আসিলেন না। তখন রামকৃষ্ণদেব যোগীনের পরিচিত একটী লোককে ডাকিয়া একদিন বলিলেন, "অমুকের ছেলে

কি রকম লোক? কানপুরে যাবার আগে তার নিকট এখানকার পয়সা কড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডেকে পাঠালেও আসে না। বোলো তো তাঁকে।" যোগীনের মনে ছিল, কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ৪।৫টী টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দ্রব্যগুলি তিনি ইতিপূর্ব্বেই কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন—উহারই বাকি কয় আনা পয়সা তাঁহার নিকট ছিল। তাহা নানা হাঙ্গামায় এতদিন পাঠান হয় নাই। প্রথমে যোগীন ভাবিয়াছিলেন, নিজেই তাঁহাকে ঐ পয়সা ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন। বিবাহের পর যখন স্থির করিলেন, আর রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবেন না, তখন অপর কাহাকেও দিয়া উহা পাঠাইয়া দিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এখন রামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ অনুযোগ শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, "আমার সকল আশা ভরসা গেছে বটে, কিন্তু তা বলে এখনো এত হীন হই নি যে, চুরি করব। তিনি কি আমাকে এখন এতদূর খারাপ ঠাওরান নাকি? যাই হোগ্, আজই তাঁর পয়সা ফেলে দিয়ে আসব।"

এই ভাবিয়া যোগীন সেইদিনই অপরাহ্নে রাসমণির বাগানে গমন করিলেন এবং বিষণ্ণচিত্তে আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রামকৃষ্ণদেবের ঘরের পূর্ব্বদিকের দালানে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ছোট চৌকিখানির উপর বিবস্ত্র হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কাপড়খানি কোলের উপর জড়সড় করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব বালকের ন্যায় কাপড়খানি বগলে করিয়া বেগে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। কি এক অপূর্ব্বভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল তখন প্রদীপ্ত হইয়াছে। কি এক অনৈসর্গিক শক্তিতে তিনি যেন পূর্ণ হইয়াছেন! হাত ধরিয়াই

বলিলেন, "বে কোরেছিস্—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে কোরেছি। বে কোরেছিস্—তা ভয় কি? (নিজ বক্ষে হস্ত রাখিয়া) এখানকার কৃপা থাক্‌লে একটা কি, লাখটা বেতেও তোর কিছু কর্‌তে পারবে না। তোর যদি সংসারে থাক্‌তে ইচ্ছে হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস্। তাকে এমন কোরে দেব যে, সে তোর ধর্ম্মপথের সহায় ছাড়া কখন বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার কর্ত্তে না ইচ্ছে হয় ত বলিস্, তোর মায়া মমতা সব খেয়ে ফেল্‌বো।" রামকৃষ্ণের মুখ মণ্ডলে যেন অগ্নিশিখা খেলিতে লাগিল।

যোগীন নির্ব্বাক্। এ সব কি কথা—এ কথা কি সম্ভব? কিন্তু নিরাশার অন্ধকারময় গহ্বর হইতে তাঁহার মন যেন সহসা সূর্য্যালোকে আনীত, ইনি কে, আর এ কি অহেতুকী কৃপা, এই কৃপা করিবার জন্যই কি পরমহংসদেবের মিথ্যা অভিযোগ প্রভৃতি নানা ছল করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিবার উদ্যোগ! হতাশপ্রাণে আশাতরু ফুলফলে পল্লবিত হইয়া উঠিল, মরুভূমি আবার 'সুখময় সায়রে' পরিণত হইল।

আর সে পয়সাকড়ির কথা রামকৃষ্ণদেব একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, যোগীন বলিলেও শুনিলেন না, বলিলেন, "ঐ ভাঙ্গা টিনের বাক্সটার ভেতর রেখে দে।"

একদিন রামকৃষ্ণদেব মহেন্দ্র মাষ্টারকে বলিলেন, "দেখ বিদ্যাসাগরের কাছে আমায় এক দিন নিয়ে যাবে? বিদ্যাসাগরকে দেখ্‌তে বড় সাধ হয়েছে।" প্রায় বাল্যকাল হইতেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ও সুখ্যাতি শুনিয়াছেন। বিদ্যাসাগর দয়ার অবতার, তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই। যেখানে গুণের বিকাশ, রামকৃষ্ণ সেইখানেই আকৃষ্ট। তিনি বলিতেন, "যাকে দশে মানে

গুণে, তাতে শক্তির অধিক বিকাশ; সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক কৃপা, জান্‌বি।” সেজন্য গুণীর গুণের সমাদর কর্‌তে হয়, মানীকে মান দিতে হয়। তাই গুণী লোকের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মহেন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, তাই তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের কাছে লইয়া যাইতে কহিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই এক দিন বৈকালে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ীতে করিয়া রামকৃষ্ণদেব ভবনাথ, মহেন্দ্র ও হাজরাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। পথে এক স্থলে গরুর গাড়ীর ভিড় হওয়ায়, অল্পক্ষণের জন্য খানকয়েক আরও ভাড়াটীয়া গাড়ী সেই স্থলে দাঁড়াইয়া গেলে রামকৃষ্ণদেব দেখিলেন, একজন লোক, একখানি গাড়ীতে বসিয়া আপনার মোজা পরা পাখানি নাড়িয়া চাড়িয়া নিরীক্ষণ করিয়া যেন বিমোহিত হইতেছে। মোজা পরিয়া পায়ের এমন শোভা হয়, তাহা যেন সে ইতিপূর্ব্বে কখন অনুভব করে নাই। ভবনাথও তাহা দেখিয়া রামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, “মশাই, এ লোকটা বোধ হয় জন্মে কখনও মোজা পরেনি।” রামকৃষ্ণদেব তদ্দৃষ্টে মা কালীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “আহা মা! এর ভোগ হয় নি মা, এ ভোগ করে নিগ মা একে ভোগ করতে দেমা।” *

বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়া আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, “মা! বিদ্যেসাগরকে দেখ্‌তে যাচ্ছি মা, আমার কিন্তু বিদ্যে নেই মা, লেখা পড়া কিছুই জানিনা মা!” এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি সমাধিস্থ হইলেন। এমন সময়ে গাড়ী ৺রাজা রামমোহন রায়ের

* আমরা ভবনাথ প্রভৃতির নিকট ইহা শুনিয়াছি।

বাড়ীর নিকট আসিলে মহেন্দ্র বলিলেন, "মশাই, এই রামমোহন রায়ের বাড়ী।" রামকৃষ্ণদেব একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন "উঁঃ! এখন ওসব কথা ভাল লাগ্‌ছে না।" মহেন্দ্র দেখিল, রামকৃষ্ণদেব তখনও সমাধির ঘোরে রহিয়াছেন। ক্রমে গাড়ী বিদ্যাসাগরের বাড়ী আসিলে, ভবনাথ রামকৃষ্ণদেবের হাত ধরিয়া নামাইলেন। রামকৃষ্ণের পরিধানে—একখানি সরু লালপেড়ে ধুতি এবং একটী সাদা জামা, কোঁচার খুঁটটী স্কন্ধে ফেলা। জামার বন্দ খোলা ছিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে বাগান, বাগানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রামকৃষ্ণ জামার বন্দ খোলা দেখিয়া, মাষ্টারকে কহিলেন, "হ্যাঁগা, এগুলো খোলা রয়েছে, তাতে কিছু দোষ হবে কি?" মাষ্টার কহিলেন, "না মশাই, আপনার ওতে দোষ হবে না।" সকলে তখন প্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বিতলে উঠিয়া যে প্রকোষ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বিদ্যাসাগর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করজোড়ে প্রণাম পূর্ব্বক রামকৃষ্ণদেবকে 'আস্‌তে আজ্ঞা হয়' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণদেব, একদৃষ্টে, তাঁহার প্রতি তাকাইয়া, বলিতে লাগিলেন, "এত দিন খাল বিলে ছিলুম, আজ সাগরে এসে মিশলুম।"

বিদ্যাসাগর হাসিয়া বলিলেন, "আগে মিষ্টি জলে ছেলেন, এখন নোনা জলে এলেন, তা খানিক নোনা জল নিয়ে যান।"

রামকৃষ্ণদেব হাসিয়া কহিলেন,—"তা কেন গো, অবিদ্যার সাগর নোনা হয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তোমাতে কেন নোনা জল হবেক্? আমি ক্ষীর সমুদ্রে এসেছি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিনীতভাবে, "আপনি যখন বল্‌ছেন, তা হবে", এই বলিয়া হুকা লইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ-

দেব সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "তামুক খাব, তামুক খাব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন হুঁকাটী দিতে অগ্রসর হইলে কহিলেন, "না কারুর হুঁকায় খাই নি; তুমি কোলকেটা দেও।"

বিদ্যাসাগর কহিলেন, "যদি কারুর হুঁকোয় খান না ত কোলকেটা বা কেন; আমি নূতন হুঁকো কোলকে আনিয়ে দিচ্ছি।" তখনি একজন একটী নূতন হুঁকায় তামাক আনিয়া রামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে ধরিল। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তখন সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। বার কয়েক টানিয়া আর টানিতে পারিলেন না: কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, বলিলেন, "একটু জল খাব।" বিদ্যাসাগর মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বর্দ্ধমান থেকে মেঠাই এসেছে আনাব, ইনি খাবেন কি?"

মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞে বেশ ত আনান্।" বিদ্যাসাগর তাঁহার একটী দৌহিত্রকে জলযোগের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু বালকের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী রেকাবিতে চারিটী মিঠাই ও এক গেলাস জল আনিয়া মেজের উপর রাখিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহার সঙ্গীদের দেখাইয়া কহিলেন, "এদের দেও।" বিদ্যাসাগর কহিলেন, "আপনি আগে গ্রহণ করুন রামকৃষ্ণদেব এক কণা মুখে দিয়া জলপান করিলেন; পরে মিঠাইগুলি সকলকে দেওয়া হইল।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "দেখ, সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কাজেই এঁটো হয়েছে; কিন্তু সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের কত্তে পারে নি, কাজেই তিনি উচ্ছিষ্ট হন নি।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এ রকম

সামান্য কথায় এমন গভীর ভাবের কথা কোথাও শুনিনি ত, অনেক শাস্ত্র পড়্‌লুম কিন্তু এমন ভাবের কথা কৈ পাইনি!" পরে মাষ্টারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি কি এঁরই কথা বলেছিলে?"

মাষ্টার কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় মাষ্টার মহাশয়ের নিকট রামকৃষ্ণদেবের কোথায় নিবাস ছিল, কোথায় এখন থাকেন, এই সমস্ত তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "কামারপুকুর যে আমাদের গ্রাম বীরসিংহের মাত্র তিন চার ক্রোশ তফাতে।"

তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, "মশাই, ব্রহ্মের স্বরূপ কি?"

রামকৃষ্ণ কথায় কিছু না বলিয়া গাহিতে লাগিলেন, "মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে..."

তাহার পর আবার গাহিলেন,

"কে জানে কালী কেমন?
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন;
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥"

গাহিয়া একটু ভাবস্থ হইলেন, পরে ভাব সম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'তাঁর উদরের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড,' আর তাঁর 'ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন' বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাসের এমনি জোর যে, একজন সমুদ্দুর পার

হয়ে, বিভীষণ তার কাপড়ের খুঁটে একটা জিনিস বেঁধে দিয়ে বল্লেন, 'তুমি এটা খুলে দেখ না; এর জোরে তুমি পার হয়ে যাবে।' সে বেশ খানিকটা এসে একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাব্‌লে, 'বিভীষণ কি বেঁধে দিলে যে, তার গুণে জলের ওপর দিয়ে এমন হেঁটে চলেছি? দেখি।' খুলে দেখে, একটি পাতায় কেবল 'রাম'—এই কথাটি লেখা! 'ও মা! এই জিনিষ', যেমন এই ভাবা, অমনি ডুবে যাওয়া!" এই বলিয়া আবার গাহিলেন, "দুর্গা দুর্গা বলে" ইত্যাদি, তাহার পরে "মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে" ইত্যাদি। গান শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইল।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "যিনি ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্মশক্তি, যিনিই সগুণ তিনিই নির্গুণ, আর তাঁকেই মা কালী বোলে ডাকি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন নির্গুণ, আর যখন তাঁর লীলা দেখি. তখন তাঁকে সগুণ ভাবি। পূজ, হোম, যাগ, সবই তাঁর প্রতি ভালবাসা আন্‌বার জন্যে। যখন সেই ভালবাসা আসে, তখন ওসব কর্ম্ম কমে যায়। যতক্ষণ না বাতাস বয় ততক্ষণ পাখা নাড়তে হয়, আর হাওয়া বইলে কে পাখার বাতাস খায়? গেরস্থের বৌ অন্তঃসত্ত্বা হ'লে গিন্নি তার কাজ ক্রমে কমিয়ে কমিয়ে দেয়। তার পর ছেলে হ'লে, শাশুড়ী তাকে আর কোন কাজই কর্‌তে দেয় না। তখন সে সেই ছেলেটীকে নিয়েই নাড়া চাড়া করে। তুমি যে সব কাজ কর্‌ছ. সব সৎকর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়। জগতের কল্যাণ তিনি ছাড়া মানুষে কর্‌তে পারে না, এইটি জেনে কামনা ত্যাগ কোরে সৎকর্ম্ম কর্‌লে তাঁর কৃপালাভ হয়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাবার্ত্তায় চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে এক ব্যক্তিকে কহিতে লাগিলেন, "কি চমৎকার কথা।" সে ব্যক্তি কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অতি চমৎকার।" রামকৃষ্ণদেব,

লোকটীর ভাব গতিক দেখিয়া, একটী গল্প বলিলেন, "ও দেশে (কামার-পুকুরের নিকট) ব্যাঙ্গাই গ্রামে এক জমিদারের একজন লোক ছেল। জমিদারের মনযোগান তার কাজ। একদিন আম্‌ড়ার অম্বল চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না হয়েছে। জমিদার আম্‌ড়ার অম্বল খেতে খেতে বল্‌লে, 'আমড়ার অম্বল কেমন হে?' লোকটী বল্‌লে, 'মশাই তা আর কি বল্‌ব, মশাই, অতি পরিপাটি, আম্‌ড়ার অম্বলের মত কি আর অম্বল হয়?' আমড়া, জান ত, শাঁসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, খালি আঁটি আর চামড়া; আবার খেলে হয়—অম্বলশূল!" কথা শুনিয়া সকলে মহা হাস্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব গাত্রোত্থান করিলেন তাঁহার সঙ্গে আর আর সকলেই উঠিলেন।

রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ আপুনি সব জান, কত শাস্ত্র পড়েছ; এ সব যা বল্‌লুম, সব বাহুল্য। তবে এক কথা, বরুণের ভাণ্ডারে কত রত্ন আছে তা তার খবর নেই।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আপনি যা বলেন।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁগো; বড় মানুষেরা সব চাকরদের নাম জানে না, মনে রাখ্‌তে পারে না, বাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন্ জিনিষটা আছে তাও জানে না।" একটা উচ্চ হাসি পড়িয়া গেল। পরে রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে কহিলেন, "আপুনি একবার রাস-মণির বাগান দেখ্‌তে যাবে, খুব চমৎকার জায়গা।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাগ্রহে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব বই কি; আপনি এলেন আর আমি যাব না? অবিশ্যি যাব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "আপুনি যেতে পারবেক্ নি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, "সে কি মশাই, কেন যেতে পারব না, আমায় বুঝিয়ে দিন?"

রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে কহিলেন, "আমরা জেলে ডিঙ্গি, খাল বিলে যাই, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। আপুনি জাহাজ, কেমন করে ছোট নদীতে যাবে, যদি চড়ায় আট্‌কে যাও?" আবার একটা মহা হাসি পড়িয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। হয় ত মনে করিলেন, বলিয়া রাখা ঠিক নহে, কারণ নানা কার্য্যে যদি নাই যাইতে পারেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, পরে রামকৃষ্ণদেবের কথাই ঠিক হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইচ্ছা করিয়াও আর তাঁহার নিকট যাইতে পারেন নাই।

যাহাহউক রামকৃষ্ণদেব সে যাত্রা বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আলোক হস্তে অগ্রসর হইয়া গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, গাড়ীর নিকট একজন উষ্ণীষধারী লোক দণ্ডায়মান। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "বলরাম, এত রাত্রে এখানে?"

বলরাম কহিলেন, "আজ্ঞে, আপনাকে দর্শন কর্‌তে।" বলরাম ভাবিয়াছিলেন, ঠিক সময়ে আসিয়া সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিবেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া শুনিলেন, রামকৃষ্ণদেব অনেক পূর্ব্বে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রামকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণের আশা পরিত্যাগ করিয়া, শেষে তাঁহার দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

বলরাম, "আজ্ঞে এই আস্‌ছি।"

রামকৃষ্ণদেব, "ভেতরে গেলে না কেন?"

বলরাম সহাস্য মুখে কহিলেন, "আজ্ঞে, সকলে আপনার কথা শুন্‌ছেন; ভাবলুম, আর মাঝখানে আমি গিয়ে বিরক্ত কর্‌ব না।"

মাষ্টার পদব্রজে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; রামকৃষ্ণদেব, বলরামকে বাগবাজারে নামাইয়া দিয়া, দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন।

বহুদিন পূর্ব্বে কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ Indian Mirror নামক ইংরাজি খবরের কাগজে পড়িয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। গিরিশ ভাবিলেন যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছেন, সেইরূপ একজন পরমহংসও খাড়া করিয়াছেন। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। ইহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলেন, তাঁহাদের বসুপাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহলবশতঃ দেখিতে গেলেন, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়াই শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর গলিস্থ বলরাম বসুর ভবনে রামকৃষ্ণদেব আসিবেন। সাধূত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পাড়ার অনেককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতিবেশী কবিবরকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঘোষজ মহাশয় দর্শন করিতে গেলেন। দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছেন; বিধু কীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামের বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। পরমহংসের আচরণে কবি চূড়ামণির একটু চমক হইল। তিনি জানিতেন, যাহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেয়, তাহারা কাহারও সহিত কথা কয় না, কাহাকেও নমস্কার করে না, তবে কেহ যদি অতিশয় সাধ্য সাধনা করে, পদসেবা করিতে দেয়। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বের ইয়ার, পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া

বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।" কথাটা ঘোষজ মহাশয়ের ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখ্‌বে ?" কবিবরের ইচ্ছা ছিল আরও কিছু দেখেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় জিদ্ করি‌া কবিবরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (তখন উহা ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে) "চৈতন্য-লীলার" অভিনয় হইতেছে, গিরিশচন্দ্র রঙ্গালয়ের বহিঃ-প্রাঙ্গণে বেড়াইতে ছিলেন, এমন সময় মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখ্‌তে এসেছেন, বস্‌তে দেও ভাল, নচেৎ টিকিট কিন্‌ছি।"

গিরিশ কহিলেন, "তাঁর টিকিট লাগবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগবে।" এই কথা বলিয়া তিনি রামকৃষ্ণদেবের অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; ঘোষজ মহাশয় না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন। ঘোষজ মহাশয় নমস্কার করিলেন, পুনরায় তিনিও নমস্কার করিলেন ; ঘোষজ আবার নমস্কার করিলেন, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। ঘোষজ ভাবিলেন, "এইরূপই ত দেখ্‌ছি চল্‌বে।" সুতরাং ঘোষজ মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটী বক্সে বসাইলেন ও এক জন আড়ানী পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া গেলেন। এই তাঁহার তৃতীয় দর্শন।

চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে ঘোষজ মহাশয়ের নিজের অবস্থার

পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহার পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্য গণ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজি-শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যা ক্রিশ্চিয়ান্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ; শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে, এবং বৈষ্ণবসমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ঘোষজ মহাশয় ইংরাজি দুপাতা পড়িয়াছেন—কালা-পাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে, প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না। মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্ক চলে। আদিসমাজেও কখন কখন যাওয়া আসা করেন, একটী ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যান্। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ; যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান্ যদি থাক, আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মনে দাম্ভিকতা আসিল।

ভাবিলেন, জল, বায়ু, আলো ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা অজস্রচ্ছল রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান্ বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথা ঠিক। ভাবিলেন, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা। এরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।

পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঘোষজকে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, বিপন্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? ঘোষজ মহাশয় দেখিয়াছেন, অসাধ্য রোগ হইলে লোকে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। ভাবিলেন, "আমারও ত কঠিন বিপদ—একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাক্‌লে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করে দেখা যাক্।" শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলেন, চেষ্টা সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে ত মুক্ত হইলেন, কিন্তু পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব—কোন্ পথ অবলম্বন করিব? ভাবিলেন, "তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি।" ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ঘোষজ ভাবিলেন, "কেন, উপায় নাই? এইত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কোন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে কর্‌ব? শুন্‌তে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান কর্‌তে হয়, কিন্তু আমার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি?" তাঁহার মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। তিনি মানুষকে গুরু করিতে পারিবেন না।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিবেন? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সাহত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাই-বেন? ভাবিলেন, "যাক্, আমার গুরু হবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করে আমার গুরু হোন্। শুনেছিলাম, নরবেশ ধরে কখন কখন মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই ভাল; নচেৎ আমি নিরুপায়! কিন্তু তারকনাথের ত কৈ দেখা পাই না, তবে আর কি কর্‌ব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম কর্‌ব, তার পর যা হয় হবে।"

এই সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়; তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন। সত্য হোক্ আর মিথ্যা হোক্, একদিন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ভগবান্‌কে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখন কখন রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে; কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হলে হয় না। কবিবরের মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ ঘটনার তিন দিন পরে তিনি কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছেন; দেখিলেন, চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে নারায়ণ আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরম-হংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। ঘোষজ মহাশয় তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র পরমহংসদেব নমস্কার করিলেন। সে দিন কবিবর

নমস্কার করায় পুনর্ব্বার আর নমস্কার করিলেন না। তাঁহার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, কবিবরের বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল রামকৃষ্ণদেবের দিকে কে টানিতেছে। রামকৃষ্ণদেব কিছুদূর গিয়াছেন, ঘোষজ মহাশয়ের ইচ্ছা হইল—তিনিও তাঁহার সঙ্গে যান। এমন সময় রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে তাঁহাকে একজন ডাকিতে আসিলেন, বলিলেন "পরমহংসদেব ডাক্‌ছেন।" গিরিশচন্দ্র চলিলেন, পরমহংসদেব বলরাম বসুর বাড়ীতে উঠিলেন, তিনিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। বলরাম বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বসুজ মহাশয়ের সহিত দুই একটী কথা বলিবার পর, পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া "বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি," বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাপন্ন হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "না, না ঢং নয়, ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। ঘোষজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরু কি?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক*।"

তিনি আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে।"

ঘোষজ—"মন্ত্র কি?" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানন্দ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করতেন। ঘাটের সিঁড়ীতে কবীর নামে এক জোলা শুয়েছিল। রামানন্দ নাম্‌তে নাম্‌তে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে

* পরমহংসদেব এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' উচ্চারণ করলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হল। আর সেই নাম জপ করে কবীরের সিদ্ধিলাভ হল।"

পরে থিয়েটারের কথা পড়িল। রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখিও।"

ঘোষজ উত্তর করিলেন, "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখ্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "কিছু নিও।"

ঘোষজ—"ভাল, আট আনা দেবেন।"

পরমহংসদেব বলিলেন, "সে বড় ব্যাজলা জায়গা।"

ঘোষজ উত্তর করিলেন, "না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছেলেন, সেই খানে বস্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "না একটী টাকা নিও।"

ঘোষজ "যে আজ্ঞে" বলায়, একথা শেষ হইল।

বসুজ মহাশয় তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। ঠাকুর একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। ঘোষজ মহাশয়েরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কে কি বলিবে—লজ্জায় পারিলেন না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত বসুজ মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে হরিপদ কবিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন" গিরিশ কহিলেন, "বেশ ভক্ত।" তখন ঘোষজার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্য হতাশ ভাব আর নাই। ভাবিলেন, "গুরু কর্‌তে হয়, মূর্খে বলে। এইত পরমহংস বললেন আমার গুরু হয়ে গেছে, তবে আর কার কথা শুনি?"

যে কারণ মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাহা একরূপ

বলা হইয়াছে, কিন্তু এখন বুঝিতেছেন যে, তাঁহার মনে প্রবল দম্ভ থাকায় তিনি গুরু করিতে চাহেন নাই। ভাবিতেন, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড় হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি ঘোষজাকে নমস্কার করিলেন। রামকৃষ্ণদেব যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাহা ঘোষজার ধারণা জন্মিল, এবং তাঁহার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা ঘোষজার মনে দিন দিন উঠে। বলরাম বসুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ঘোষজা মহাশয় থিয়েটারের সাজ ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় পূর্ব্বোল্লিখিত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "পরমহংসদেব এসেছেন।" তিনি বলিলেন, "ভাল, বক্সে নিয়ে গিয়ে বসান।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করে নিয়ে আস্‌বেন না?"

ঘোষজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নাম্‌তে পার্‌বেন না?" কিন্তু গেলেন।

তিনি পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় পরমহংসদেব গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া, ঘোষজার পাষাণ হৃদয়ও গলিল, আপনাকে ধিক্কার দিলেন, সে ধিক্কার আজিও তাঁহার মনে জাগিতেছে। ভাবিলেন, "এমন পরম শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাইনি।" তাঁহাকে উপরে লইয়া গেলেন, তথায় তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কেন যে করিলেন, তাহা তিনি আজিও বুঝিতে পারেন না। তাঁহার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, তিনি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া পরমহংসদেবকে

দিলেন। তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু আবার ফিরাইয়া দিলেন, "ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করব।"

ড্রেস্ সার্কেলের দর্শকের কনসার্টের সময় বসিবার জন্য ষ্টার থিয়েটারের দ্বিতলে স্বতন্ত্র একটী কামরা ছিল। সেই কামরায় রামকৃষ্ণ-দেব আসিলেন, অনেকগুলি ভক্তও তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, ঘোষজাও অপর এক চৌকিতে বসিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্বেও বসিতেছেন না। কবিবরের পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রের সহিত আলাপ ছিল। ঘোষজ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "বসুন না।" কিন্তু তিনি অসম্মত। ঘোষজ কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ঘোষজ মহাশয় বলেন, "আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বস্‌তে নেই, ইহা আমি জান্‌তাম না।" পরমহংসদেব ঘোষজার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কবিবরের বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন তাঁহার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণদেব ভাব নিমগ্ন হইলেন। একটী বালক ভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু পূর্ব্বে তিনি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংস-দেবের নিন্দা শুনিয়াছিলেন। এই বালকের সহিত ঐরূপ ক্রীড়া দেখিয়া সেই নিন্দার কথা তাঁহার মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি নাট্যাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার মনে বাঁক আছে।"

গিরিশ ভাবিলেন, অনেক প্রকার বাঁক ত আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঁক যায় কিসে ?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "বিশ্বাস কর "

আবার কিছুদিন গত হইল; গিরিশ বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছেন, একটী চিরকুট পাইলেন যে মধুরায়ের গলিতে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংস আসিবেন। পড়িবামাত্র তাঁহাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। তিনি যাইতে ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলেন যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইবেন? কিন্তু ঐ অজানিত সূত্রের টানে বাধা রহিল না; চলিলেন। অনাথ বাবুর বাজারের নিকট যাইয়া ভাবিলেন, "যাইব না।" ভাবিলে কি হয়, তাঁহাকে টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হন, আর থামেন। রামচন্দ্রের গলির মোড়ে গিয়া থামিলেন। পরে রামচন্দ্রের বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে রামচন্দ্র বসিয়া আছেন; ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষজকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এখানে এসেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "পরমহংসদেবকে দর্শন কর্‌তে।" রামচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রের বাড়ী। তিনি তথায় ঘোষজকে লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সব কথা ভাল লাগিল না। তিনি তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামচন্দ্রের উঠানে রামচন্দ্র খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে—"নদে টলমল্ করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে।" তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামচন্দ্রের আঙ্গিনা টলমল্ করিতেছে! তাঁহার মনে খেদ হইতে

লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনিও গ্রহণ করেন, কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। ভাবিলেন, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। তাঁহার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও তিনি নৃত্য করিতে করিতে ঠিক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার আর চরণস্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামচন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন, তিনিও উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব তাঁহারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কবিবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মনের বাঁক যাবে ত ?" পরমহংসদেব কহিলেন, "যাবে।" কবিবর আবার ঐ কথা বলিলেন, পরমহংসদেব ঐ উত্তর দিলেন। ঘোষজ মহাশয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের পরম ভক্ত মনোমোহন মিত্র কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "যাও না, উনি বল্লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত করছ ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়া গিরিশ ইতিপূর্ব্বে কখন ক্ষান্ত হন নাই। মনোমোহন মিত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, "ইনি সত্যই বলেছেন, যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নেই, তিনি শতবার বল্লেও ত তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়।" কবিবর রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলেন। দেবেন্দ্র কিয়দ্দূর তাঁহার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক দিন ঘোষজ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন; অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঘোষজ যাইয়া রামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, মনে মনে 'গুরুর্ব্রহ্মা' ইত্যাদি স্তবটীও আবৃত্তি করিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বল্‌ছিলুম, মাইরী; একে জিজ্ঞেস কর।" পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঘোষজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "আমি উপদেশ শুনব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, তাতে কিছু হয় না; আপনি যদি আমার কিছু করে দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন. তাঁহাকে বলিলেন. "কিরে, কি শ্লোকটা বল্‌ত?" রামলাল দাদা শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন; শ্লোকের ভাব—পর্ব্বত গহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। ঘোষজ মহাশয়ের তখন মনে হইতেছে, "আমি নির্ম্মল।" তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" তাঁহার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, তাঁহার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল? এ কাহার আশ্রয় পাইলেন, যে আশ্রয়ে তাঁহার সকল ভয় দূর হইয়াছে?

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "আমায় কেউ বলে আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানেই থাকি।" তিনি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছেন, রামকৃষ্ণদেব উত্তরের বারাণ্ডা অবধি তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমায় যা করি তাই করতে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন, "তা কর না।" তাঁহার কথায় ঘোষজার মনে হইল, যেন যাহা করেন তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার হৃদয়ে আসিল; গুরুই সর্ব্বস্ব তাঁহার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন ভজন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—তাঁহার জন্ম সফল।

শঙ্কর ঘোষের নাম কলিকাতাবাসীদের মধ্যে সুবিখ্যাত। ঠন্‌-ঠনিয়ার কালীবাড়ী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাহারই নিকট শঙ্কর ঘোষের গলিতে তদ্‌বংশীয়গণের বর্ত্তমান বাস। বিষয় বৈভব তাদৃশ না থাকিলেও ঐ বংশীয়গণের কলিকাতা-সমাজে এখনও বেশ মান আছে। সুবোধ এই বংশের সন্তান, বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৭।১৮র অধিক নহে। একদিন পিতার নিকট একখানি ছোট পুস্তক পাইল—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি"। রামকৃষ্ণদেবের জনৈক শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন—উহা তাহাই। সুবোধের পিতাঠাকুর একজন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাল পুস্তকাদি সুবোধকে পড়িতে দিতেন। সুবোধের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড় ভাল লাগিল। পিতাকে বলিলেন, "পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরমহংস-দেবকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।" পিতা বলিলেন, বেশ কথা, আফিসের যখন ছুটী থাকিবে, তখন বাড়ীর সকলে মিলিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করিবেন। কিন্তু সুবোধের বিলম্ব অসহ্য; সে তাহার জনৈক প্রতিবেশী বালক বন্ধুকে ডাকিয়া

রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং দুই এক দিন পরেই কোন কারণে বিদ্যালয়ের সকাল সকাল ছুটী হইলে, দুই বন্ধুতে মিলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাড়ী হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া সে এতদূরে কখনও কোথায়ও যান নাই। পথে সুবোধ বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ্, বাড়ীতে ব'লে আসা হয় নাই—টের পেলে ব'ক্‌বে; খুব শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর চ'লে যাই চল—সন্ধের আগেই ফির্‌তে হবে।" এই বলিয়া দুজনে খুব বেগে চলিতে চলিতে একেবারে আঁড়িয়াদহে উপস্থিত। পথে একজনকে "পরমহংস মশাই কোথায় থাকেন" জিজ্ঞাসা করায় লোকটী বলিল, "আপনারা পথ ভুলে দূরে এসে প'ড়েছেন।" পরে একটী ধেনো জমীর মধ্যবর্ত্তী আল পথ দেখাইয়া বলিল, "এই খান দিয়ে যান, শিগ্‌গীর রাসমণির বাগানে পৌঁছিবেন।" সুবোধ ইহার পূর্ব্বে মাঠে চাষাদের কৃষিকার্য্য করিতে কখনও দেখেন নাই; ধানক্ষেত্র দেখিয়া তাঁহার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল—অমনি তাঁহার চলনও ঢিলা হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ধীরপদে কিয়দ্দূর যাইলে পর প্রতিবেশী বালক তাহাকে বলিলেন, "চল্ চল্, দেরী হচ্চে।" সুবোধের হুঁস হইল যে পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া সন্ধ্যার অগ্রেই ফিরিতে হইবে, আবাব বেগে চলিলেন এবং অল্পক্ষণেই রাসমণির বাগানে পৌঁছিলেন। সুবোধের ধারণা, পরমহংস একজন বাজীকর, নানা ভেল্কি দেখায়। কিন্তু এ পরমহংসের উক্তি পড়িয়া মনে হইয়াছে ইনিই একজন সাধু। সাধুর সহিত কথোপকথন সুবোধ ইতিপূর্ব্বে কখনও করেন নাই; পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলেন তাই বন্ধুকে বলিলেন, "দেখ্ তুই এগিয়ে পরমহংসের সঙ্গে কথা কইবি; আমি সাধুদের সঙ্গে কেমন ক'রে মান্য ক'রে কথা কইতে হয়, জানিনি

আমার পরিচয় চান্ তুই সব ব'ল্‌বি, যা জান্‌তে চান্ ব'ল্‌বি। আমি কিন্তু কথা কইব না। তোর পেছনে থাক্‌ব, তুই এগিয়ে থাক্‌বি।" বন্ধু বলিলেন, "আচ্ছা।"

অতঃপর রামকৃষ্ণদেবের ঘরের দ্বারে প্রবেশ করিয়াই করযোড়ে তাঁহাকে দুজনে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন. "আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছ!"

প্রতিবেশী বন্ধু বলিলেন, "ক'ল্‌কেতা থেকে।" পরমহংসদেব বলিলেন, "ও বাবুটী অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, অতদূরে কেন, এগিয়ে কাছে এস না।" সুবোধ বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত মত পশ্চাতে একেবারে দ্বারের নিকট ছিলেন ও বন্ধুটী ঘরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সাদর আহ্বানে সুবোধ একটু অগ্রসর হইলেন; রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি শঙ্কর ঘোষের বাড়ীর—না?"

সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ—আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তোদের বাড়ীতে কতবার গেছি, তুই তখন জন্মাস্‌নি। তুই এখানে আস্‌বি জান্‌তুম। যাদের হবে, মা তাদের পাঠিয়ে দেন। তুই অত দূরে কেন, কাছে আয় না—কাছে আয়।"

বারম্বার কাছে আসিতে বলায় বালক তাঁহার নিকটে আসিলেন। নিকটে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণদেব তাহার হাত ধরিলেন। হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া কিছুক্ষণ রহিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, তোর হবে; মা বল্লেন—তোর হবে। আপনার তক্তপোষ দেখাইয়া বলিলেন, "এই বিছানায় বোস্।" ডাক্তারেরা যেমন হাত ধরিয়া লোকের

শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা জানিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তদ্রূপ লোকের হাত ধরিয়া তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তাহার ধর্ম্মলাভ হইবে কি না, যথাযথ বুঝিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সকল শিষ্যেরাই একবাক্যে সাক্ষ্যদান করেন।

বালক কহিলেন, "না মশাই; ইস্কুলের কাপড়—কতলোককে ছুঁয়েছি, প্রস্রাব করেছি, এ কাপড়ে আপনার কাছে ও বিছানায় ব'স্‌ব না।"

রামকৃষ্ণদেব তাহা শুনিলেন না—হাত ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে বসাইলেন। অগত্যা বালক অল্পক্ষণ বসিয়া তথা হইতে নামিয়া সম্মুখে মেঝেয় বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন ব্যস্ত হইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে একখানি আসন আনিতে বলিলেন। রামলাল দাদা আসন আনিলে সুবোধ তদুপরি এবং তাঁহার বন্ধু রামকৃষ্ণদেবের আসনের নিকট যে পাপোষ খানি ছিল, তাহার উপর বসিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোমরা কেমন করে এখানে এলে?" সুবোধ তাঁহার আদর যত্ন পাইয়াছেন, আর মনে ভয়ের ভাব নাই, কলিকাতার ছেলেরা যেমন করে, সকল কথায় চোটপাট জবাব দিতে লাগিলেন। সুবোধ কহিলেন "হেঁটে এলুম।" রামকৃষ্ণদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "বলিস্ কিরে? এতটা পথ হেঁটে এলি! তা এখানকার খবর পেলি কি করে?"

সুবোধ বলিলেন, "আপনার উক্তি প'ড়ে বড় ভাল লাগ্‌ল, আপনার কি চমৎকার কথা। আপনার কত নাম, আপনি কতই মহৎ লোক, তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।"

এই কথা বলিবামাত্র রামকৃষ্ণদেবের ভাবান্তর হইল। তিনি

অমনি বলিলেন, "আমি গুয়ের কীটেরও অধম, আমার আবার নাম কি? আমি গুয়ের কীটেরও অধম।" বালক এই কথার সঙ্গে তাঁহার মুখের অপূর্ব্ব দীনভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "যাদের ধর্ম্ম হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তা দেখ্, এখানে শনি মঙ্গলবারে আসিস্। এখানে শনি মঙ্গলবারে আসা ভাল। তোদের পাড়ার কত লোক শনি মঙ্গলবারে আসে। তুইও আসিস্।" সুবোধ বলিলেন, "তা হ'লে মশাই বাড়ীতে জান্‌তে পার্‌বে। আপনার বল্‌বার যা আছে, তা এখনই সব ব'লে ফেলুন না। শনিবারে ত আস্‌তে পারবই না —সে দিন বাবার সকাল সকাল আফিসের ছুটি হয়।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "নারে, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে, তা ক'র্‌তেই হবে। এই যে দ্যাখ্ না—যেখানে অমুক দিন যাব বলি, তা ঝড় হোক্, বৃষ্টি হোক্, বাদল হোক্, যেতেই হবে। ইচ্ছে না থাক্‌লেও মা সেখানে নিয়ে যাবেনই যাবেন, কিছুতেই নিস্তার নেই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, শনিবার কি মঙ্গলবারে এখানে আসিস্।"

কাজেই সুবোধ রাজী হইলেন ও ভাবিলেন 'আজ আর বেশীক্ষণ থাকিব না—আজ আর বেশী কিছু কথাও হবে না।' অতঃপর বাটী ফিরিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কিছু খাবি?" সুবোধ উত্তর করিলেন, "তা বাড়ী গিয়ে খাব এখন।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে জল খা, তারপর যাবি।" এই বলিয়া লাটুকে একটু মিষ্টান্ন ও জল আনিতে বলিলেন। সুবোধ ও তাহার বন্ধু জলযোগের পর ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "অনেকটা দূর, ছেলেমানুষ, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, পয়সা দিতে বলি, গাড়ী কি নৌকায় যা।"

সুবোধ, বলিলেন, "সাঁতার জানিনি, নৌকোয় যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব, কহিলেন "তবে গাড়ী করে যা।"

সুবোধ পুনরায় কহিলেন, "না হেঁটেই যাব।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন. "নারে, কষ্ট হবে, ছেলেমানুষ. এতটা পথ হাঁট্‌তে পার্‌বি কেন?"

সুবোধ পুনরায় কহিলেন, "এই বয়সে হাঁট্‌ব না ত হাঁট্‌ব কবে? আর আপনি পয়সা দেবেন কেন? আপনি পয়সা পাবেন কোথায়?"

রামকৃষ্ণদেব একটু হাসিয়া বলিলেন "ওরে এখানে অনেকে দেয়, তোর তা কিছু ভাব্‌তে হবে না। পয়সা দিতে ব'ল্‌ছি, গাড়ী ক'রে যা।

সুবোধ কিছুতেই পয়সা লইতে রাজী হইলেন না। রামকৃষ্ণদেব অবশেষে অপর বালকটিকে বলিলেন, "তুমি পয়সা নাও, দুজনে গাড়ী করে যেও।" সুবোধ বন্ধুকে বলিলেন, "নারে, পয়সা নিস্‌নি, হেঁটেই যাব।" অগত্যা পরমহংসদেব আর জিদ্‌ না করিয়া কহিলেন, "আসিস্‌, শনি মঙ্গলবার দেখে আসিস্‌" তাঁহার পদধূলি লইয়া বন্ধুদ্বয় হন্‌ হন্‌ করিয়া বাড়ী অভিমুখে চলিলেন।

ইতিপূর্ব্বে সুবোধ হেয়ার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। গণিত বিদ্যায় তাহার একটু বেশী প্রীতি ছিল। প্রতিবার পরীক্ষার সময় মনে করিতেন "এবার ফুল নম্বর পাব।" পাছে না পায় সেজন্য ঠাকুর দেবতার শরণ লইয়া পরীক্ষা দিতে যাইতেন। আবার দুই চারি নম্বর কম পাইলে দেবতার উপর রাগ করিয়া বলিতেন "দেব্‌তা টেব্‌তা সব মিথ্যে।" বাল্যকালে দেবদেবীর উপর যে ভাবভক্তি ছিল, কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর আর তাহা তেমন রহিল না। যদি বা কখন একটু বিশ্বাস আসিত, তাহা ঐপ্রকারে দেবদেবীর ক্ষমতা পরীক্ষায় নিয়োজিত হইয়া ভাসিয়া যাইত। এই

সময়ে তিনি চতুর্থ শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা বাড়ীতে উত্থাপিত হইল। বড়বংশ, কাজেই ভাল ভাল ঘরের সহিত সম্বন্ধের কথা আসিতে লাগিল। সুবোধের কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপরিস্ফুট ছবি অহরহ মনোমধ্যে জাগিয়া থাকিত। তিনি মাঝে মাঝে ভাবিতেন, আমি বিবাহ করিব না, কারণ, বাড়ীতে ত থাকিব না। নানাদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, পর্ব্বত জঙ্গল দেখিয়া বেড়াইব। অতএব বিবাহের প্রয়োজন নাই। অতঃপর পিতামাতাকে স্পষ্ট একদিন কহিলেন, "আপনারা আমার বিবাহ দেবেন না। আমি বিবাহ কর্‌ব না।"

পিতা বলিলেন, "কেন, বিবাহ কর্‌বে না কেন? এই বছরটা উঠে পড়ে ভাল ক'রে পাশ কর, বেশ ভাল যায়গায় বিবাহ হবে।" সুবোধ কহিলেন, "দেখুন, আপনারা যদি জিদ্ করে বে দেন, ত আমার আর উপায় নেই, আপনাদের কথা ত অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌ব না, বে কর্‌ব; কিন্তু আমার বাড়ীতে থাকা হবে না। কোথায় কোন্‌দেশে চলে যাব, তার কিছুই ঠিক নাই। বাড়ী থেকে সংসার করা আমার পোষাবে না। তাই বল্‌ছি—মিথ্যা একটা বিবাহ দিয়ে আমার ছেঁড়া লেঠা জড়ানর আর দরকার কি?"

পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, এ বৎসরটা ত ভাল করে পড়, তারপর বোঝা যাবে।" সুবোধ তাঁহার কথার আভাসে বেশ বুঝিলেন, এবার পরীক্ষার ফল ভাল হলেই পিতা বিবাহ দিবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, এ বৎসর তাহার পরীক্ষার ফল যেন খুব মন্দই হয়। পড়াশুনায় আর তাহার মন লাগিল না। ফলেও তাহাই হইল। স্কুলের শিক্ষকেরা পরীক্ষার পর পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "এ বৎসর সুবোধ তৃতীয় শ্রেণীতে থাকিলে পরে ভাল হইবে।"

পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় সুবোধের পিতার বিবাহ দিবার ঝোঁকও কমিয়া গেল। অতঃপর সুবোধ হেয়ার স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। অতএব তিনি যখন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যান, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে-ছিলেন।

প্রথম দর্শনের পরেই যে শনিবার আসিল, সেই শনিবারে সুবোধ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, স্কুল পলাইয়া দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি লোক। ঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া করযোড়ে প্রণাম করিবামাত্র পরমহংসদেবের সঙ্গে তাহার চোখোচোখী হইল। রামকৃষ্ণদেব অভয় কর উত্তোলন পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিলেন, ঐখানেই থাক। বালকের মনোভাবও তাহাই, তিনি ঘরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, পাছে পাড়ার কোন লোক থাকে ও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দেয়। রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে ইঙ্গিত করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকদের "তোমরা একটু বস, আমি এখনি আস্‌ছি" বলিয়া বাহিরে আসিলেন। বেলা তখন প্রায় ৩টা।

রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় মানসপুত্র রাখাল সেখানে ছিলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন। গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠের দক্ষিণেই যে শিবমন্দির তাহার সিঁড়ির উপরে আপনি আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন। এবং সুবোধ ও তাঁহার বন্ধুকে বসিতে বলিলেন। এবারেও সুবোধ পূর্ব্ববারের ন্যায় তাঁহার বন্ধুকে সকল বিষয়ে অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব এইবার দুইজনকেই জামার বন্ধ খুলিতে বলিলেন এবং অপর বালকটিকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। তিনি জিহ্বা বাহির করিলে তাহাতে কি লিখিয়া দিলেন

এবং তাঁহার নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত হস্তস্পর্শ করিলেন। এইবার সুবোধের পালা। সুবোধের ইংরাজি ঢৌলের কামিজ, এখনও সকল বন্ধ খোলা হয় নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আর বিলম্ব সহ্য হয় না, কি যেন এক ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষুদ্বয় পদ্মাভশিবনেত্র হইয়াছে। তিনি স্বহস্তে ফড় ফড় করিয়া সুবোধের বোতাম খুলিয়া দিলেন এবং পূর্ব্বোক্তভাবে তাঁহার জিহ্বা ও শরীর স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী !!"

পরে উভয়কে ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার মেরুদণ্ড-মধ্যে এক প্রবল স্রোত উত্থিত হইয়া মস্তিষ্ক-মধ্যে ধাবিত হইতেছে, বোধ হইতে লাগিল। পরে সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব উপস্থিত হইল এবং ভিতরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন হইতে লাগিল। ধ্যান ক্রমে গভীর হইল এবং "আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কাহার কাছে আছি, কি করিতেছি," সুবোধ সমস্ত কথা বিস্মৃত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির মধ্যে ক্রমে কত দেব, কত সুপ্রসন্ন দেবীমূর্ত্তি একে একে উদিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইতে লাগিল। তৎপরে সুবোধের আর সংজ্ঞা রহিল না। যখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন সুবোধ দেখিলেন পরমহংসদেব তাঁহার মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ করিয়াছিলেন, তদ্বিপরীত ভাবে তাঁহার শরীরে হস্ত বুলাইতেছেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তুই কি বাড়ীতে ধ্যান কর্‌তিস্ ?"

সুবোধ বলিলেন, "একটু আধটু ঠাকুরদেবতার বিষয়ে মার কাছে যা শুনতুম্, তাই ভাব্‌তুম্।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তাই তোর এত শীগ্‌গীর হল।" পরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু দেখ্‌তে টেখ্‌তে পেলে হা?" সে কহিল, "না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "পরে পাবে।"

সুবোধ প্রকৃতিস্থ হইলে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের আবার বলিলেন, "এখন যা, পঞ্চবটীতে গিয়ে একটু ধ্যান কর্‌গে," এই বলিয়া গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গেলেন।

এদিকে সুবোধ পঞ্চবটী কাহাকে বলে, তাহার কিছুই জানেন না! নহবৎখানার নিকট যাইয়া (যেখানে মাতাঠাকুরাণী অবস্থান করিতেন) দেখিলেন স্ত্রীলোকের জনতা। সুবোধ ঐ স্থানেই পঞ্চবটী ভাবিয়া বন্ধুকে বলিলেন, 'তুই পঞ্চবটীতে যা, আমি কালীমন্দিরে যাই।" এই বলিয়া সুবোধ কালীমন্দিরে যাইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। একটু পরে তাঁহার বন্ধু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুবোধ ধ্যানমগ্ন। বালকের ধ্যানাবসানে বন্ধু কহিলেন, "ওখানে অনেক মেয়েরা রয়েছেন, তাই আমি চলে এলুম।" পরে দুজনে বিদায় লইবার জন্য পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরে জনতা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণদেব সে দিনও জিদ্ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন এবং গাড়ী করিয়া বাটী যাইবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করিলেন।

সুবোধ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কহিলেন, "তবে একটা ছাতি নিয়ে যা, এখনও বড় রদ্দুর।"

সুবোধ কহিলেন, "মশাই আবার কবে আস্‌তে পার্‌ব না পার্‌ব, এখানকার ছাতি নিয়ে যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব অবশেষে সুবোধের বন্ধুকে কহিলেন, "ওগো, তুমি একটা ছাতি নিয়ে যাও !"

সুবোধ তাহাকে বলিলেন, "নারে, এখানকার ছাতি নিয়ে যাবি, আবার ওঁদের কখন দরকার হবে তখন পাবেন না, নিয়ে যাস্ নি।"

পরমহংসদেব কহিলেন, "না দরকার হবে না। ফেরৎ দেবার জন্যে কোন ভাবনা কর্‌তে হবে না। তোরা একটা ছাতি নিয়ে যা।" একজনকে তাঁহাদের একটী ছাতি দিতে অনুমতি করিলেন। অগত্যা সুবোধ আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাষ্টার আছে, সে এখানে আসে, বেশ লোক, তার কাছে যাস্, আর মাঝে মাঝে এখানে আসিস্।" সুবোধ কোন উত্তর করিলেন না; আসিতে পারিবেন, কি না পারিবেন, সেইজন্য।

বাল্যকাল হইতেই সুবোধের রাত্রে অন্ধকারে বড় ভয়। একেলা শয়ন করিতে ভয়, সেইজন্য তাঁহার বিছানার পার্শ্বেই তাঁহার ঠাকুরমার বিছানা থাকিত; রাত্রে উঠিতে হইলে বৃদ্ধা সঙ্গে যাইতেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ লাভ করিয়া অবধি তাঁহার পূর্ব্বের ভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিলেন "বাড়ীতে থাকা ত কখনই হবে না। কিন্তু মাঠে, ঘাটে, গাছতলায়, কোথায় কত দেশে থাকতে হবে এত ভয় ডর হলে কেমন করে চল্‌বে?" অতঃপর ভয় কমাবার চেষ্টা করা উচিত; রাত্রে উঠবার আবশ্যক হলে আর ঠাকুরমার সাহায্য নেওয়া হবে না। তদবধি রাত্রে উঠিয়া অন্ধকারে বুক দুর দুর করিলেও সুবোধ একাকী যাওয়া আসা করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাওয়ার পর হইতে সুবোধ নিজ ভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতিঃ কখন কখন দেখিতে পাইতেন। বালকের মনের

সকল কথাই মাতার সহিত হইত। কারণ, মাতা বাল্যকালে তাঁহাকে নানা গল্প ও উপদেশ শুনাইতেন, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, সত্য পালন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুখ-পরিণাম, তাঁহার অত্যন্ত কৃপা যথা—সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে তাহার আহারের যোগাড় করিয়া রাখা ইত্যাদি এবং উহা হইতেই যে তাঁহার মনে ধর্ম্মবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও ঐরূপ জ্যোতিদর্শনের কথা আপনার মাতাকে বলিলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা, আর কারুকে এসব কথা বল না, এসব বড় ভাগ্যে হয়, সবাইকে বল্‌লে ক্ষতি হয়।"

বালক উত্তর করিলেন, "মা ক্ষতি কি হবে? ও সব নিয়ে আমি কি কর্‌ব? যে বস্তু থেকে এই আলোর উৎপত্তি, সেই বস্তুই যদি না পাই ত আমার ও আলোটা কাজ কি?"

সুবোধের আর লেখাপড়া করিতে মন লাগে না। সদাই পরমহংসদেবের নিকট যাইতে বাসনা হয়। আপন ভাবে কখন ধ্যান, কখন জপ, কখন বা ঈশ্বর-চিন্তা লইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব ইহার পূর্ব্বে মহেন্দ্রনাথকে সুবোধের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেন্দ্র মাষ্টার মহাশয় তজ্জন্য প্রায় পত্র লিখিয়া সুবোধকে ডাকিয়া পাঠান। পত্র পাইয়া সুবোধ বালক-বুদ্ধিতে ভাবেন "মাষ্টার মহাশয় স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর করেন, তাঁহার কাছে গিয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম আবার কি শিখ্‌ব? যদি ধর্ম্ম শিক্ষা কর্‌তে হয় ত কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী পরমহংসের কাছেই শিখ্‌ব। সংসারী লোকের কাছে যাব না।"

দিন কয়েক পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সে দিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে সুবোধের পরিচয় করিয়া দিলেন। সুবোধ, শরৎ ও শশীকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এদের দাড়ী

আছে, বোধ হয় বাঙাল।" কিন্তু নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহাদের কলিকাতায় চাঁপাতলায় বাড়ী; কথাবার্ত্তাও দেখিলেন, ঠিক কলিকাতার লোকের ন্যায়, তথাপি তাঁহাদের দাড়ী দেখিয়া স্থির করিলেন, ইহারা নিশ্চয়ই বাঙাল।

যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোদের বাড়ী থেকে এদের বাড়ী কত দূর? তোরা এর বাড়ী যাবি।" আবার সুবোধের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুইও এদের বাড়ী যাবি, আলাপ কর্‌বি।"

সুবোধ, শরৎ ও শশীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদের বাড়ী যাব। আপনারা আমাদের বাড়ী যাবেন না।" সুবোধের কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া—রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কেন রে! তুই ওদের বাড়ী যাবি, আর ওরা তোদের বাড়ী যাবে না কেন?"

সুবোধ বলিলেন, "বাবা রাগ কর্‌বেন।"

রামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোরা নরেনের সঙ্গে এর আলাপ করে দিবি। এর বাড়ী থেকে নরেনের বাড়ী কাছে।" তাহার পর সুবোধকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ্, নরেন বড় ভাল ছেলে, যেমন পড়াশুনাতে, তেমনি গাইতে বাজাতে, তেমনি বল্‌তে কইতে, এখানে প্রায়ই আসে, আমাকে খুব ভালবাসে।" ক্ষণিক পরে রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে আবার বলিলেন, "হ্যাঁরে মাষ্টারের বাড়ী তোর বাড়ী থেকে খুব কাছে। তার কাছে যাস্‌নি কেন? যাস্।"

সুবোধ উত্তর করিলেন, "মশাই তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করেন, তাঁর কাছে কি কর্‌তে যাব?" সুবোধের বৈরাগ্যপূর্ণ কথায় রামকৃষ্ণদেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওরে সে আর কোন কথাই কইবে না, এইখানকার কথাই কইবে। তুই যাস্ তার কাছে।"

সুবোধ অগত্যা কহিলেন, "আপনি যখন বল্‌ছেন, যাব।"

ইহার দুই একদিন পরেই মাষ্টার মহাশয় আবার একখানি চিকুট লিখিয়া সুবোধকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুবোধ গেলেন। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে খুব আদর যত্ন করিয়া কহিলেন, "তিনি (রামকৃষ্ণদেব) এখানে আস্‌তে বলেন, আসনা কেন?"

সুবোধ উত্তর করিলেন, "আপনি সংসারী ব'লে আপনার কাছে এতদিন আসিনি। তবে তিনি (রামকৃষ্ণদেব) বল্‌লেন, আপনি তাঁর কথাই কইবেন, তাই এলুম।"

মাষ্টার কহিলেন, "সে কথা ঠিক্‌, আমরা সামান্য মানুষ। তবে সাগরের ধারে বাস করি, এক আধ কলসী সাগরের জল এনে রাখি, কেউ এলে সেই জলই দিই, এই পর্য্যন্ত। তাঁর কথা ছাড়া আর কি কথা কইব? এই যে এতটা পড়াশুনো কর্‌লুম, তাঁর কাছে গিয়ে সবই ত মিথ্যা হয়ে গেল। লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে ফেলেছি। ও মা! তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্‌লুম, সব বিদ্যা—অবিদ্যা; সব কোথায় ভেসে গেল, মনে হল, কি আশ্চর্য্য, এই বিদ্যা নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার হয়!"

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সুবোধের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পরে মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে মিষ্ট মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সেবকেরা এইরূপে পরস্পর এক অপূর্ব্ব ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত হইতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের আজ প্রায় মাসাবধি রামকৃষ্ণদেবের গলায় বেদনা বাড়িয়াছে, শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তাঁহার ত্যাগী বালব্রহ্মচারী শিষ্যেরা প্রায় সকলেই কাছে থাকে। সুবোধ একদিন এই সময়ে দেখা করিতে যাইয়া বলিলেন, "মশাই, দক্ষিণেশ্বরে আপনি যে স্যাঁতানি

ঘরে থাকিতেন, বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে আপনার গলায় ব্যথা হয়েছে, আপনি চা খেতে পারেন না? আমরা সব চা খাই, আপনি চা খান, বেদনা সেরে যাবে। আমার বাবার চায়ের আপিস আছে, আমাদের বাড়ীতে খুব ভাল ভাল চায়ের নমুনো আসে, আমি আপনার জন্য উৎকৃষ্ট চা এনে দেব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁরে, এই চা খেলে গলার বেদনা সেরে যাবে?"

সুবোধ কহিল, "হ্যাঁ, মশাই; আমাদের গলায় ব্যথা হ'লে চা খাই, ভাল হ'য়ে যায়।" সেখানে রাখাল প্রভৃতি প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণদেব রাখালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রাখাল, তবে চা খাওয়াই যাগ্, এ চা এনে দেবে ব'লছে।"

রাখাল কহিলেন, "চা কি আপনার সহ্য হবে?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "সহ্য হবে না?"

রাখাল কহিলেন, "সে যে বড় গরম। তাই ব'লছি, আপনার হয় ত সহ্য হবে না। উল্‌টে গরম হ'য়ে যাবে।"

রামকৃষ্ণদেব অমনি ছেলে মানুষের মত কহিলেন, "তবে কাজ নেই বাপু, আবার গরম হ'য়ে যাবে।" রামকৃষ্ণদেবের এইরূপ বালকের মত স্বভাব দেখিয়া সুবোধ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

সুবোধের রামকৃষ্ণদেবের উপর টান দিন দিন বাড়িতে লাগিল; এই সময় রামকৃষ্ণদেবের গলায় ক্ষত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা তাঁহাকে চিৎপুরের নিকট কাশীপুরে একটী বাগানবাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে রাখিয়াছেন। সুবোধ ঘন ঘন স্কুল পলাইয়া তথায় গমন করেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে

বাড়ী আসেন। একদিন আবশ্যক হইলে পরমহংসদেব তাঁহাকে "সীতাপতি রামচন্দ্র" ইত্যাদি গানের একটী চরণ লিখিতে বলিলেন। হাতের লেখা ভাল নয় বলিয়া তিনি উহা লিখিতে নারাজ হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তথাপি বলিলেন, "লেখা যেমনই হোগ্ তুই লেখ্ না, না হয় একটু খারাপই হবে।" সুবোধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "দূর বোকা, কেবল বুঝি খেলিয়ে বেড়িয়েছিস্।" সুবোধ এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাই দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোকে যে গাল দিলুম, তুই রাগ কর্‌লিনি?" সুবোধ ত্বরিৎ উত্তর করিলেন, "মশাই, আপনার গালাগালও মিষ্টি।" রামকৃষ্ণদেব অমনি আহ্লাদে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে শোন্, শোন্, এ বলে কি শোন্। বলে—গালাগালও মিষ্টি লাগে।" তৎপরে স্নেহময়ী জননীর মত হস্তদ্বারা সুবোধের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

যে প্রকোষ্ঠে রামকৃষ্ণদেব বাস করেন তাহা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ঘরের জিনিষ পত্র অল্প বটে, কিন্তু যেখানকার যাহা সাজান ঝক্‌ঝকে। ঘরের চতুষ্পার্শ্বের স্থান দুইবেলা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা হয়। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কাহাকেও অসাবধানতা বশতঃ যদি কখন উক্ত স্থানে থুতু ফেলিতে দেখেন অমনি তাহাকে নিষেধ করিয়া কহেন, "ওরে কর্‌লি কি? এসব জায়গায় মা পাইচারি করেন, অপরাধ হবে। অমন কাজ আর করিস্‌নি। যা, গঙ্গাজল এনে ওখানটা ধুয়ে ফেল।" সে তখনি তাহা করিল, এবং যদি তাহার যেখানে সেখানে থুতু ফেলা রোগ থাকে ত তাহাও চিরদিনের মত আরোগ্য হইল। রামকৃষ্ণদেব সেইঘরে একদিন প্রভাতে পদচারণ

করিতেছেন, নরেনের জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক। নরেন্দ্রনাথ কিছু দিন তাঁহার কাছে আসেন নাই। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব সম্বন্ধ। কেহ তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ও আমার শ্বশুর ঘর। কেমন জান," এই বলিয়া নিজ বক্ষে হস্ত দিয়া কহিলেন, "এর ভেতর যে আছে, ওর সাম্নে সে ঘাড় হেঁট করে ;" আর আপনার দক্ষিণ হস্ত সর্পাকৃতি করিয়া তাহার মস্তক অবনত করাইয়া দেখাইলেন। আবার কখন বা বলিতেন, "নরেন আমার শিরোমণি।" রামকৃষ্ণের পা ধুইবার জন্য যে জল থাকিত সেই জল যদি নরেন কোন কারণে স্পর্শ করিতেন, তবে সে জল মহা পবিত্র হইয়া যাইত, তাহাতে আর তিনি পা ধুইতে পারিতেন না। পাছে অন্যমনস্ক হইয়া তাহাতে পা ধুইয়া ফেলেন, সেই জন্য সে জল ফেলিয়া দিয়া অন্য জল আনাইয়া রাখিতেন। আজ সেই নরেন্দ্রনাথের জন্য তাঁহার প্রাণমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বি, এ, পরীক্ষার আর অল্প দিন মাত্র আছে। নরেন্দ্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সুতরাং সময়াভাবে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন না। রামকৃষ্ণদেব ঘরে পদচারণ করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নিকটে নৌকা আসিতে দেখিলেই মনে করিতেছেন, "বুঝি বা নরেন আসিতেছে ;" অমনি দ্রুতপদে ঘাটের দিকে চলিলেন। নৌকা চলিয়া গেল, নরেন্দ্র আসিলেন না, বালকের ন্যায় হতাশে কাঁদ কাঁদ হইয়া আবার ঘরে ফিরিলেন। সূর্য্যোদয় হইতেই আজ নরেনকে দেখিবার জন্য কাতর। খানিকক্ষণ পর আর সহ্য হইল না, রামলালকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিলেন, শিমুলিয়া নরেনের বাটী যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন। রামলাল গাড়ী আনিলে

তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণদেব কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে যখন হৃদয় নিকটে ছিল তখন তাঁহারি সঙ্গে এইরূপ মধ্যে মধ্যে নরেনের বাটী যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন।

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেম্ব্লির কালেজে পড়েন। এফ্. এ, সেইখান হইতেই পাশ করিয়াছেন। নরেনের অসংখ্য গুণে সহপাঠিরা অনেকে তাঁহার বড়ই বশীভূত। তাঁহার গান, তাঁহার মিষ্ট কথা-বার্ত্তা তর্ক-যুক্তি শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে তাঁহারা অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তর্ক-যুক্তি বা গান-বাজনা আরম্ভ হইলে, সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুই বেলা কেবল আহার করিতে যান। আর সমস্ত দিবা রাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিস্থ মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তাহা নহে। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়ীতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান জপের বড়ই ব্যাঘাত হয়। মাতামহীর বাড়ীতে বেশী লোক নয়,—দুই এক জন যাহা আছে তাহাদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কচিকাচা ছেলে, যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়, এখানে একটীও নাই। যে ঘরটীতে থাকেন তাহা বাহির বাটীর দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই সিঁড়ী। সুতরাং বন্ধুবান্ধবের যখন যাঁহার ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হন। ঘরটী বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দীর্ঘে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটী ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর চিম্‌টি কাটিলে ময়লা উঠে এমন একটী বালিশ, মেজের উপর ছেঁড়া একটী সপ পাতা, এক কোণে

একটী তানপূরা। রামকৃষ্ণদেব এই তানপূরাটী দিয়াছিলেন। তাহারি নিকট একটী সেতারা ও একটী বাঁয়া। কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে কখন বা ঐ খাটিয়ার নীচে পড়িয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটী খেলো হুঁক, তাহার নিকট একটী সরায় স্তুপাকার তামাকের গুল আর ছাই। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশালাই রাখিবার একটী মৃত্তিকা পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে খাটের উপর, মাদুরের উপর, হেতা সেথা পড়িবার পুস্তক ছড়ান। একটী দেওয়ালে একটী দড়ী খাটান, তাহাতে কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডায় ও এখানে সেখানে তামাকে গুলের অভাব নাই, দুই একটী ভাঙ্গা শিশিও আছে, সম্প্রতি পীড়া হইয়াছিল তাহার নজির।

নরেন্দ্র মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, "ভাই, রাত্তিরে পড়িস্, এখন দুটো গান গা।" তানপূরার পাকা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিলেন, বন্ধুকে বলিলেন, "তবে বাঁয়াটা নে।"

বন্ধু কহিলেন, "ভাই আমি ত বাজাতে জানিনি।" অমনি নরেন একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, "বেশ করে দেখে নে দিখি। কিছু শক্ত কাজ নয়, এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা তা হলেই হবে;" সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই একবার চেষ্টা করিয়া বেশ ঠেকা দিতে লাগিলেন। গান চলিল, তানলয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল, টপ্পা টপ্ খেয়াল খেয়াল ধ্রুপদ, বাংলা হিন্দী সংস্কৃত। নূতন ঠেকার

সময় নরেন বোল সহ এমনি সহজ ভাবে ঠেকাটী দেখাইয়া দেন যে এক দিনেই কাওয়ালি, আড়াঠেকা, একতালা, মধ্যমান, এমন কি সুরফাঁকতাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন, আপনিও খাইতেছেন, সেটা কেবল বাজান কার্য্য হইতে একটু অবসর লওয়া মাত্র। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই, হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত সুর ও লয়ের অপূর্ব্ব ঐক্যতা দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, কে এক জন আসিয়া একটী মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হুঁষ হইল। সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইলেন, নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থে চলিয়া গেলেন বন্ধুও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যাঁহার নরেনের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনি এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন নির্ব্বিকার।

যে দিন সকালে রামকৃষ্ণ নরেনের অদর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় গমন করিলেন সে দিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্ন্যাল, বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন কখন বা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে "নরেন, নরেন" শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুঝিলেন পরমহংস আসিয়াছেন তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে

অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন সিঁড়ীর মধ্যস্থলেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। রামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুই ক'দিন যাস্‌নি কেন? তুই ক'দিন যাস্‌নি কেন?" বারম্বার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন, পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল খুলিয়া নরেনকে 'খা খা' বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখনি আসেন তখনি কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁহার জন্য আঁচলে বাঁধিয়া আনেন এবং মধ্যে মধ্যে লোক দ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একেলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তাঁহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। রামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন "ওরে, তোর গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপূরা লইয়া তাহার কাণ মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন।

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী, (তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী।
প্রসুপ্ত ভুজগা তারা আধার পদ্ম-বাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃষাণু, তাপিত হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে, স্বয়ম্ভু শিববেষ্টিনী॥
স্বচ্ছ সুষুম্নারি পথ সাধিষ্ঠান হও অতীত।
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী॥
শিরসি সহস্র দলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতুহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনী॥

গানও আরম্ভ হইল রামকৃষ্ণদেবও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্দ্ধে উঠিল; চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন

নাই ; মুখাবয়ব প্রসন্ন ভাব ধারণ করিল ; ক্রমে মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্ব্বে কোন মানুষে এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন বুঝিবা কোন কারণে রামকৃষ্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন দাশরথি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন নি। ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামা-বিষয়ক গান ধরিলেন, "একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি করে নাচ মা শ্যামা।" শ্যামা-বিষয়ক অনেক গান হইল। তাহার পর কৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক, "কেমনে বল সজনি আশা দিব বিসর্জ্জন, আসি বলে গিয়াছে আশাতে রেখেছি প্রাণ।" কৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক গান হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন কখন বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন। অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, "দক্ষিণেশ্বর যাবি ? কদিন ত যাস্‌নি। চল্‌না, আবার এখনি ফিরে আসিস্।" নরেন্দ্র তখনি সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল, কেবল মাত্র গুরুদত্ত তানপূরাটী যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন, বন্ধুরা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।